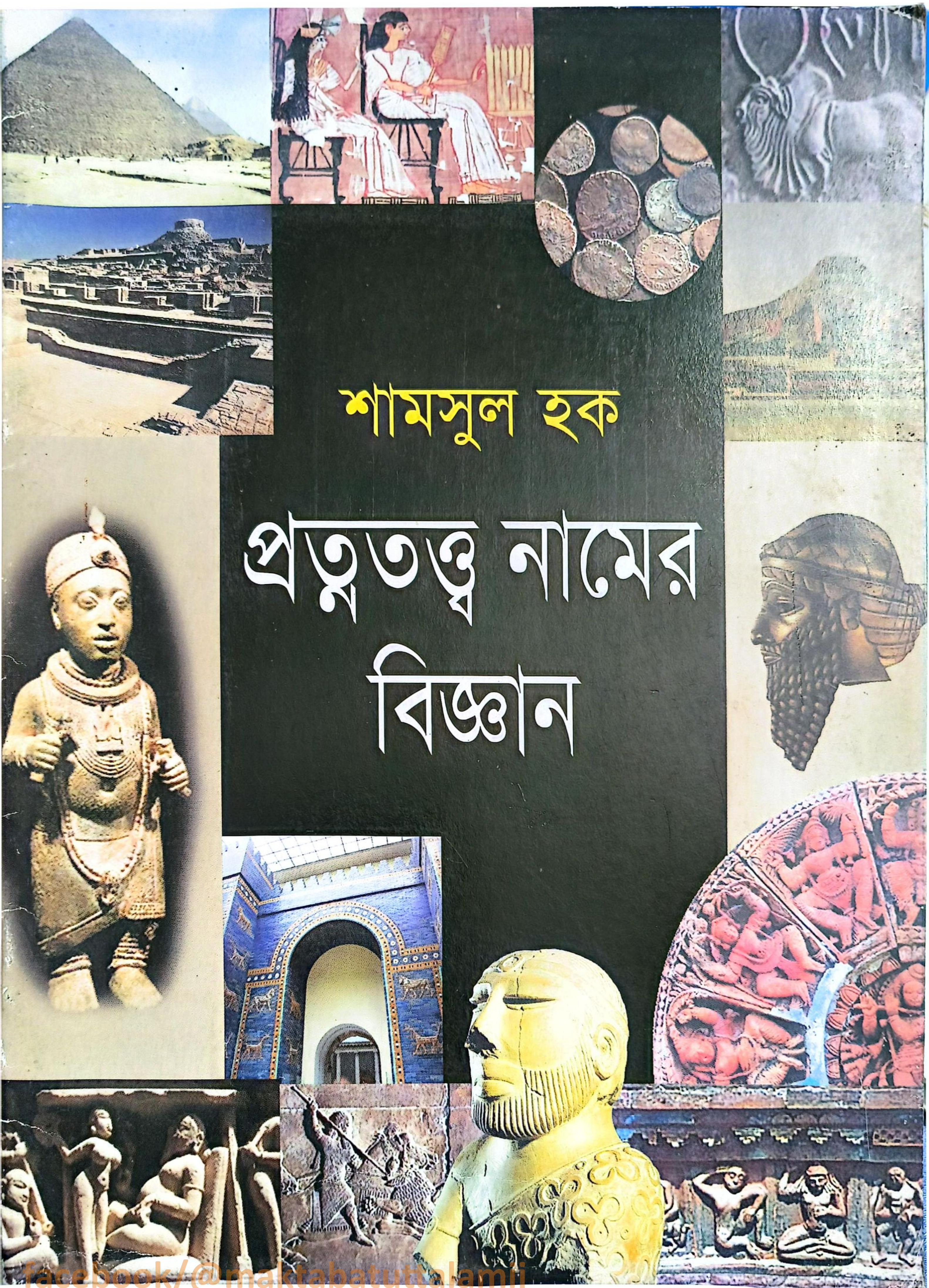

শামসুল হক

প্রত্নতত্ত্ব নামের বিজ্ঞান

facebook/@maktabatuttalamij

প্রত্নতত্ত্ব নামের বিজ্ঞান

শামসুল হক

প্রচ্ছদ ও বইনকশা

মামুন হোসাইন

বাংলাদেশ শিশু একাডেমী

facebook/@maktabatuttalamij

উৎসর্গ

পরম আদর ও স্নেহের
একমাত্র নাতনি
নাগমা-ই-আন্দালিব (অধুনা)-কে
শুভেচ্ছাসহ

নানাভাই
(শামসুল হক)

facebook/@maktabatuttalamij

সূচিপত্র

মাটির নিচে আরেক জগৎ	৪
প্রত্নতত্ত্ব নামের বিজ্ঞান	৭
প্রত্নতত্ত্বের জনক	১০
ট্রয়নগরী খুঁড়ে বের করলেন যিনি	১৩
দু'টি শহরের ইতিকথা	১৬
সার্কাস-খেলোয়াড় থেকে পুরাকীর্তি সংগ্রহকারী	২১
এক ফেরাউন ও তার কবরের কাহিনী	২৪
হারিয়ে গেল আজটেক জাতি	২৮
রাখাল থেকে ক্যাপ্টেন জেনারেল	৩২
কুয়ার ভেতর ইতিহাস	৩৬

facebook/@maktabatuttalamij

মাটির নিচে আরেক জগৎ

ইংরেজি ভাষায় বলে আর্কিয়লজি (archaeology), আর বাংলা ভাষায় বলা হয় প্রত্নতত্ত্ব বা পুরাতত্ত্ব। আর্কিয়লজি শব্দটির জন্ম হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। শব্দটি এসেছে দুটো গ্রিক শব্দ আর্কিয়জ ও লগোজ থেকে। আর্কিয় শব্দটির অর্থ প্রাচীন বা পুরনো, আর লগোজ কথাটির মানে আলোচনা করা। অর্থাৎ পুরাতত্ত্ব এমন একটি বিদ্যা যার সাহায্যে ইতিহাসের আগের মানুষ– যাদের বলা হয় প্রাগৈতিহাসিক মানুষ, তাদের সম্বন্ধে আমরা নানা অজানা বিষয় জানতে পারি। মোট কথা, যেসব মানুষ ইতিহাস শুরুর আগে পৃথিবীতে বাস করত, তাদের সম্বন্ধে আমরা জানতে পারি প্রত্নবিদ্যার সাহায্যে। আর এ কাজ আমাদের জন্য করেন প্রত্নতত্ত্ববিদ বা পুরাতত্ত্ববিদ।

কী করে তা সম্ভব?

সে কথাই তোমাদের বলছি। সেই প্রাচীনকালেও মানুষ নানা জিনিস, রকমারি হাতিয়ার ইত্যাদি তৈরি করত, ব্যবহার করত বিভিন্ন কাজকর্মে– যেমন অন্যের আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য, শিকার বধ করে পেটের খিদে মেটাবার জন্য, তারা ব্যবহার করত নানা হাতিয়ার। তারপর কাজ শেষে দরকার নেই মনে করে ফেলে যেত তাদের আস্তানায়। প্রত্নতত্ত্ববিদ ঐ সব জিনিস ও হাতিয়ার খুঁজে খুঁজে বের করেন, পরীক্ষা করেন এবং পরীক্ষা করে বলতে পারেন ঐ সব জিনিস বা হাতিয়ারের ব্যবহারকারী মানুষগুলো দেখতে মোটামুটি কেমন ছিল, তারা কী ধরনের কাজ করত এবং কত আগেই বা পৃথিবীর বুকে তাদের বাস ছিল প্রভৃতি নানা বিষয়ের কথা।

প্রত্নতত্ত্ববিদ মাটি খুঁড়ে তার নিচ থেকে ইতিহাসের বিভিন্ন আলামত বা উপাদান আবিষ্কার করেন। তিনি এমন সব জায়গায় খোঁড়াখুঁড়ি করেন এবং অনুসন্ধান চালান, যেখানে মানুষ হাজার হাজার বছর আগে বাস করত বলে তিনি মনে করেন। সব সময় তাঁর অনুমান যে ঠিক হবে, এমনটি না-ও হতে পারে। তবে অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর আন্দাজ সুফল বয়ে আনে এবং কখনো কখনো হঠাৎ-ই পাওয়া যায় হারিয়ে যাওয়া কোনো সুমহান সভ্যতার মূল্যবান ধ্বংসাবশেষ। তখন আর তাঁর আনন্দের সীমা থাকে না।

তোমরা হয়তো এতক্ষণে বুঝতে পেরেছ যে, প্রাগৈতিহাসিক মানুষের আস্তানা– শহর বা গ্রামের অস্তিত্ব প্রায় সময়ই পাওয়া যায় মাটির তলায়। তার কারণও আছে। নানাভাবে কোনো

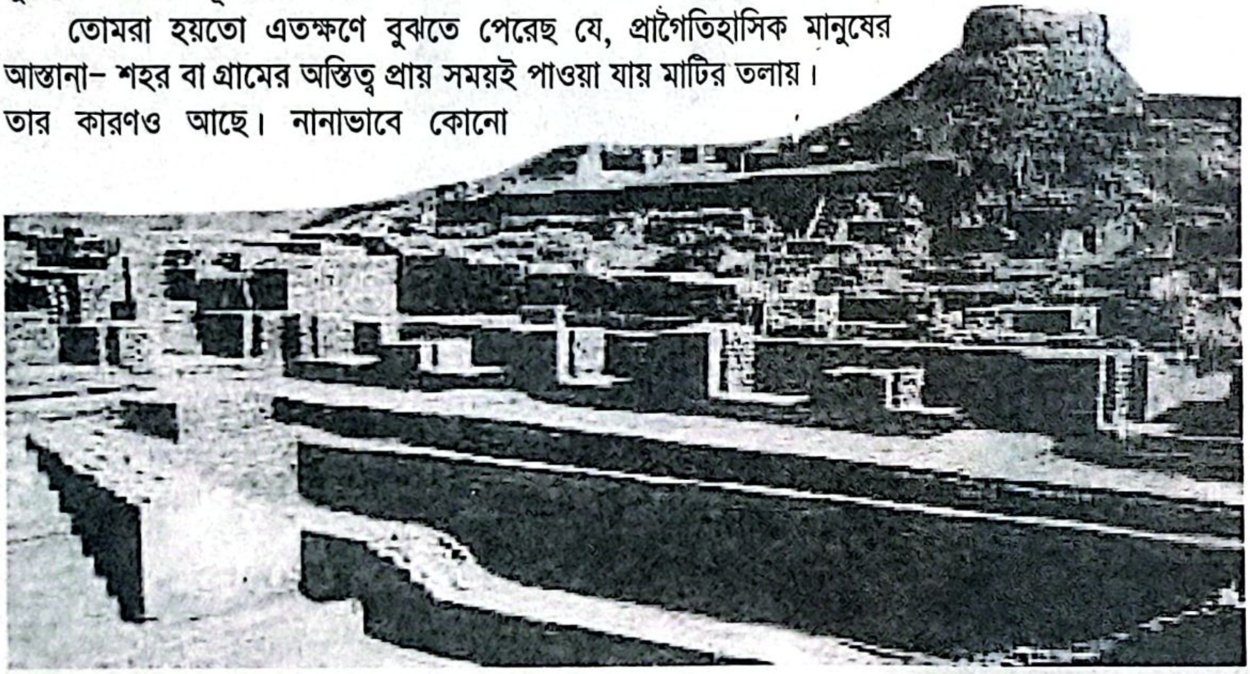

মহেনজোদারো সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ

facebook/@maktabatuttalamij

বাসস্থান বা আস্তানা ধ্বংস হতে পারে। যখন ধ্বংস হয়, তখন ঐ ধ্বংসস্তূপের ওপর আবার গড়ে উঠে নতুন কোনো বাসস্থান বা আস্তানা। নতুন গড়ে ওঠা আস্তানার নিচে চাপা পড়ে যায় পুরনো আস্তানা বা গ্রামটি। অর্থাৎ পুরনো ধ্বংসস্তূপের ওপর ধুলোবালি, মাটি, ময়লা-আবর্জনা জমতে জমতে এক সময় সেটি যায় মাটির তলায়। সেটিকে জানা ও উদ্ধারের জন্য প্রয়োজন পড়ে প্রত্নতত্ত্ববিদের।

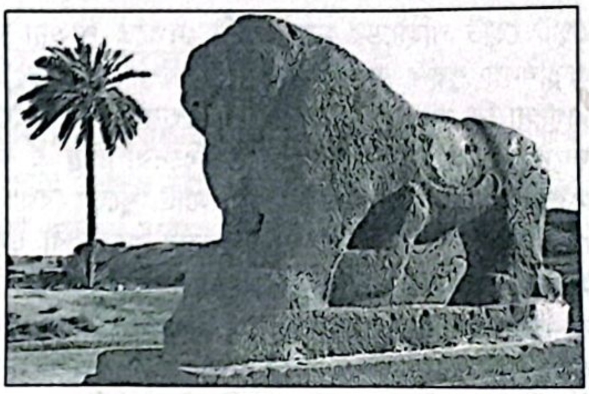

বেবিলনের সিংহমূর্তি

প্রত্নতত্ত্বকে মোটামুটি দুটো ভাগে ভাগ করা যায়। একটি প্রাগৈতিহাসিক। অর্থাৎ ইতিহাস শুরুর আগের মানুষ নিয়ে যে বিদ্যার কারবার, তাকে বলা হয় প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব। মাটি খুঁড়ে সাধারণত মাটির তলা থেকে আবিষ্কার করতে হয় মানুষের এই ইতিহাস। অন্য প্রত্নতত্ত্বটিকে বলা হয় ঐতিহাসিক প্রত্নতত্ত্ব। এ ক্ষেত্রে সব সময় মাটি খোঁড়াখুঁড়ির দরকার হয় না। এখানে প্রত্নতত্ত্ববিদকে সাহায্য করার জন্য মজুত থাকে নানা লেখা কাগজপত্র, দলিল-দস্তাবেজ ইত্যাদি। প্রয়োজন হলে তিনি খোঁড়াখুঁড়িও করতে পারেন।

মানুষের লেখা ইতিহাসের সব চাইতে পুরনো নমুনার বয়স কম করে হলেও পাঁচ হাজার বছর। আর তা পাওয়া গেছে পৃথিবীর মাত্র গুটিকয়েক দেশে। ঐ সব দেশের মধ্যে রয়েছে নীল নদের তীরে মিশর, তাইগ্রিস-ইউফ্রেতিস নদীর তীরে মেসোপটেমিয়া, সিন্ধু নদের উপত্যকায় মহেনজোদারো-হরপ্পা এবং চীনের হোয়াংহো-ইয়াংসিকিয়াং নদীর তীর।

মিশরের সব চাইতে পুরনো বইয়ের নাম 'বুক অব দি ডেড'। বইখানি লেখা হয়েছিল প্যাপিরাস গাছের ছাল দিয়ে তৈরি এক প্রকার কাগজের ওপর। বইখানি কত আগে লেখা হয়েছিল, তা কিন্তু জানা যায় না। তবে এ-বইয়ের যে কপি পাওয়া গেছে, তার বয়স পাঁচ হাজার বছরেরও বেশি। মানুষ ভুলে গিয়েছিল মিশরের ঐ প্রাচীন ভাষা। প্রত্নতত্ত্ববিদদের পরিশ্রমের ফলে সে ভাষা পড়া গেছে, বুঝতে পারা গেছে তার অর্থ, জানা গেছে মিশরের পুরনো দিনের ইতিহাস।

মিশরের মতো ইরাকের সভ্যতাও বেশ প্রাচীন। ইরাকের পুরনো নাম মেসোপটেমিয়া। মেসোপটেমিয়ার উত্তর অংশকে সে সময় বলা হত আসিরিয়া আর দক্ষিণ ভাগের নাম ছিল বেবিলনিয়া। আসিরিয়ায় রাজত্ব করতেন আসুরবনিপাল নামে এক বিখ্যাত রাজা। তাঁর রাজধানী নিনেভেতে তিনি গড়ে তুলেছিলেন এক বিশাল লাইব্রেরি। লাইব্রেরির বইগুলো লেখা হয়েছিল পাথরের টুকরোর ওপর। ব্রিটিশ প্রত্নতত্ত্ববিদেরা মাটি খুঁড়ে বের করেন আসুরবনিপালের ঐ বিখ্যাত লাইব্রেরিটি। অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে সেখানে পাওয়া যায় বারো খণ্ডের গিলগামেশ নামের একখানি মহাকাব্য। ঐ কাব্যে লেখা আছে নবী হযরত নূহ (আ.)- এর আমলে ঘটে যাওয়া এক মহাপ্লাবনের কথা। নূহের (আ.)-এর তৈরি করা এক কিস্তির কাহিনী।

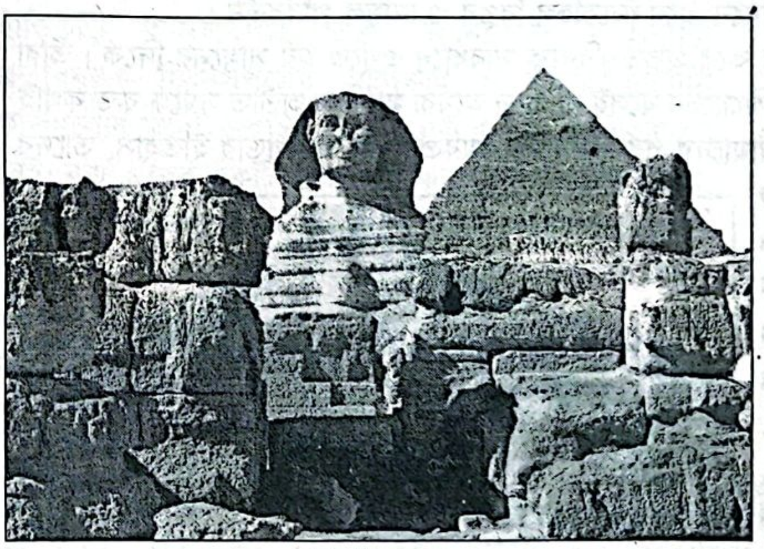

মিশরীয় সভ্যতা

আমাদের দেশেও নানা জায়গায়

facebook/@maktabatuttalamij

ছোট ছোট পাহাড়ের মতো ঢিবি দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্নবিদ্যা শুরুর আগে মানুষ ভাবত– এত উঁচু ঢিবি! এগুলো কি আর মানুষ করেছে! নিশ্চয়ই কোনো দৈত্য-দানোর কাজ। কৌতূহলী প্রত্নতত্ত্ববিদেরা কিন্তু এ কথায় সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তাঁরা মাটি খুঁড়ে বের করে দেখতে চাইলে ওসব কী এবং কেমন করেই বা ওগুলো মাটির নিচে এল। তাঁরা দিনরাত খাটলেন। শেষে জানতে পারলেন– না, ওগুলো কোনো দৈত্য-দানোর কাজ নয়। আমাদের মতো মানুষেরই ওসব অমর কীর্তি। এমনি কৌতূহল থেকেই ওঁরা আবিষ্কার করেন আমাদের দেশের মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর, ময়নামতি এবং আরো অনেক ঐতিহাসিক স্থানের ধ্বংসাবশেষ। ওঁরা দেখেশুনে গবেষণা করে বললেন : ওসব জায়গায় এক সময় গড়ে উঠেছিল বিরাট বিরাট জনপদ। আর ঐ সব জনপদেই তাঁদের প্রয়োজনের তাগিদে সৃষ্টি করেছিলেন এক একটি মহান সভ্যতা।

পাথর এবং ধাতুর তৈরি অস্ত্র

মানুষের কৌতূহল, আগ্রহ আর উৎসাহের ফলে আবিষ্কার হয়েছে সিন্ধুসভ্যতা– মহেনজোদারো ও হরপ্পা। জানা সম্ভব হয়েছে যে, প্রতিটি আবিষ্কারই মানবসভ্যতা বিকাশের এক একটি মাইলফলক। মানুষ হাজার হাজার বছর ওগুলো শুধু অবাক চোখে চেয়ে চেয়ে দেখত আর মুগ্ধ হত। এক সময় প্রত্নতত্ত্বের সূচনা হল। দেখার পালা শেষ হল। বোবা অতীত মুখর হল। জানা গেল সেগুলোর আসল ইতিহাস।

তোমরা আশা করি ডেনমার্ক দেশের নাম শুনেছ। দেশটি ইউরোপ মহাদেশের উত্তর ভাগে অবস্থিত। ঐ ডেনমার্কের এক প্রত্নতত্ত্ববিদ প্রথম প্রাগৈতিহাসিক যুগকে তিনটি ভাগে ভাগ করেন। তিনি পৃথিবীর সব চাইতে পুরনো যুগটির নাম দেন 'প্রস্তর যুগ। কারণ, সে যুগে মানুষ পাথরের হাতিয়ার ব্যবহার করত। তারপর মানুষ তার হাতিয়ার, অস্ত্রশস্ত্র ইত্যাদি তৈরি করেছিল ব্রোঞ্জ নামক ধাতু দিয়ে। তাই ঐ পুরাতত্ত্ববিদ এ যুগের নাম দিয়েছিলেন ব্রোঞ্জ যুগ। আর সব শেষের যুগের নাম দেন তিনি লৌহ যুগ। কারণ, মানুষ এ সময় তার রোজকার কাজে ব্যবহার করতে শিখেছিল লোহার তৈরি অস্ত্রশস্ত্র ও হাতিয়ার। লোহার ব্যবহার মানুষের জীবনে এনে দিয়েছিল বিপ্লব ও আমূল পরিবর্তন।

নানা অসুবিধা মোকাবিলা করে প্রত্নতত্ত্ববিদকে সাবধানে এগুতে হয় সামনের দিকে। তাঁরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে এ কাজে এগিয়েছেন বলেই না আজ আমরা মানুষের অতীত সম্বন্ধে কত কথাই না জানতে পেরেছি। আমরা লিখতে পারছি আমাদের পূর্ব-পুরুষদের চমকপ্রদ সব ভাঙাগড়ার ইতিহাস, তাদের অজানা সব কাহিনী। আমাদের এ কাজে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে বিজ্ঞান। রেডিও কার্বন ডেটিং নামে এক পদ্ধতির সাহায্যে এমন নির্ভুলভাবে বলে দেয়া যায় হাজার হাজার বছর আগেকার প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের বয়স। এই পদ্ধতিটির নাম Carbon 14. সংক্ষেপে বলা হয় C14. ড. উইলার্ড এফ. লিবি পদ্ধতিটির উন্নয়নে কাজে বিশেষ অবদান রেখে স্মরণীয় হয়ে আছেন।

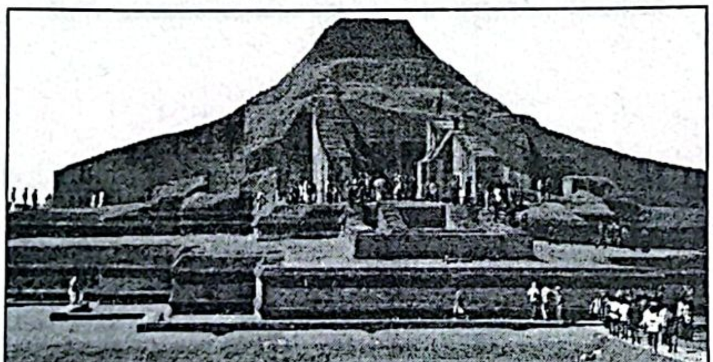

পাহাড়পুর

facebook/@maktabatuttalamij

প্রত্নতত্ত্ব নামের বিজ্ঞান

পুরনো দিনের ইতিহাস নিয়ে যার কাজ, আগেই বলেছি, তিনি প্রত্নতত্ত্ববিদ নামে পরিচিত। অন্য কথায় তাঁকে পুরাতত্ত্ববিদও বলা হয়। জার্মানিতে ছিলেন এমনি এক প্রত্নতত্ত্ববিদ। তাঁর নাম ছিল এডল্‌ফ মাইকেলিস। আজ থেকে ঠিক এক শ' বছর আগে, অর্থাৎ ১৯০৫ সালে তিনি জোর গলায় বলেছিলেন, উনিশ শতকে বিজ্ঞানের যেসব শাখা নতুন নতুন আবিষ্কারের জন্য নাম করেছে, বিজ্ঞানের সেই সব শাখার মধ্যে প্রত্নতত্ত্ব অবশ্যই অন্যতম। তোমাদের জানা ভালো যে, এডল্‌ফ মাইকেলিসই হলেন প্রত্নতত্ত্ব বিজ্ঞানের প্রথম ইতিহাস লিখিয়ে। কিন্তু তখনকার দিনের জাঁদরেল সব ইতিহাস লিখিয়েরা তাঁর কথায় মোটেও আমল দেন নি। ওঁরা তাঁর কথাকে আজগুবি বলে উড়িয়েই দিয়েছিলেন। এ জন্য অবশ্যি তাঁদের খুব একটা দোষ দেয়া যায় না। কারণ, প্রত্নতত্ত্ব জিনিসটি কী, তখন সে বিষয়ে কারুরই তেমন ধারণা ছিল না। বহু আগে, অর্থাৎ প্রাচীনকালে যা ঘটে গেছে মানুষ তা আবার জানতে পারবে– অতীত ফের মুখর হবে, কথা কইবে এবং তারই ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠবে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের রহস্যময় ও চমকপ্রদ এক অবাক করা জগৎ– এটা তাঁরা তখন ভাবতেই পারেন নি।

শুরুর দিকে পুরাতত্ত্ব শব্দটি দিয়ে শুধু 'প্রাচীন ক্লাসিক' (গ্রিক ও রোমান) শিল্প-সাহিত্য ও চারুকলা চর্চাকেই বোঝাত। কারণ, পুরনো দিনের সেই প্রথম দিককার শিল্পকলার নমুনাগুলো পাওয়া গিয়েছিল গ্রিস ও রোমের গির্জা ও রাজপ্রাসাদের মধ্যে। আর তখন থেকে ওগুলো ঝেড়ে-পুছে সাজিয়ে তোলার, অর্থাৎ পরিপাটি করে থরে থরে গুছিয়ে রাখবার এবং ওগুলো যে হেলাফেলার জিনিস নয়, বরং দামি বস্তু– তার বিশদ বিবরণ লেখার কাজও শুরু হয়েছিল।

মানুষ ধীরে ধীরে বুঝতে পেরেছিল যে, মাটির তলা থেকে খুঁড়ে বের করা পুরনো দিনের গয়নাগাঁটি, টাকাকড়ি, হাঁড়িকুড়ি, আসবাবপত্র, ভাঙা দালানকোঠা ও অন্যান্য প্রত্নবিষয়ক জিনিসপত্রের আবিষ্কার ও উদ্ধার ইত্যাদি কাজগুলোর মধ্যে একটির সঙ্গে অন্যটির খুব একটা তফাৎ নেই, বরং এদের একটি কাজ অন্য কাজের সঙ্গে দারুণভাবে, অর্থাৎ ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এ বিষয়টি মানুষ অনেকদিন গুরুত্বের সঙ্গে ভাবে নি, গ্রহণও করে নি। আরো একটি কথা। প্রত্নবিষয়ক মালমশলা ব্যাখ্যায় কেউই সেই সময়কার সামাজিক রীতিনীতি, আচার-আচরণ, নিয়মকানুন ইত্যাদি জানার জন্য গরজ বোধ করে নি, মাথাও ঘামায় নি। আজকাল অবশ্যি হালচালই বদলে গেছে। এখন যত ছোট প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারই হোক না কেন, তার ব্যাখ্যার ওপরই জোর দেয়া হয় বেশি– জিনিসটির মূল্যও দেয়া হয় ব্যাখ্যার গুরুত্ব

মহেনজোদারো থেকে প্রাপ্ত পাথরের মূর্তি

facebook/@maktabatuttalamij

অনুযায়ী। অথচ প্রত্নতত্ত্বের শুরুর দিকে উদ্ধার করা জিনিসটি বিক্রি করলে কত দাম পাওয়া যাবে, সেটিই ছিল উদ্ধারকারীর বিবেচনার প্রধান বিষয়। কিন্তু আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদের কাছে আজকাল আর ঐ বিষয়টি মোটেও গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাঁর কাছে এখন বড় বিষয় হচ্ছে, ঐ সব জিনিস তখনকার দিনের লোকেরা কি কাজে ব্যবহার করত এবং তাদের সভ্যতা গড়ার কাজে কি ভূমিকা রাখত, তা জানা এবং ঐ লোকেদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক প্রভৃতি বিষয়ে ইতিহাস রচনা করা।

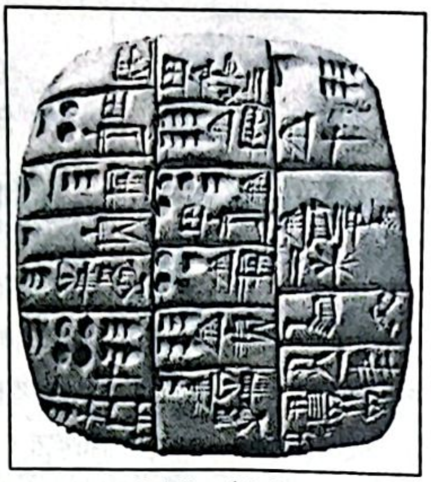

কিউনিফর্ম লিপি

প্রত্নবিজ্ঞানের গোড়া থেকেই গ্রিক ও রোমান বিষয়ের পুরাতত্ত্ববিদকে কেবল সেখানকার নানা প্রত্নসামগ্রী ও কবরগুলোরই সামনাসামনি হতে হয় নি, তাঁকে আরো মুখোমুখি হতে হয়েছিল পাথরে খোদাই করা নানা বিচিত্র সব লিপিমালারও। ঐ সব লিপির অনেকগুলো পড়া গেছে। কিছু কিছু আবার আজো পড়াই যায় নি। এ সমস্যা আরো বেড়ে গেছে যখন পুরাতত্ত্ববিদেরা তাঁদের প্রত্নতাত্ত্বিক কাজে হাজির হয়েছেন গিয়ে প্রাচ্যের দেশগুলোতে এবং খুঁড়ে বের করেছেন একেবারে অজানা ও হারিয়ে যাওয়া সব নতুন নতুন সভ্যতা ও সংস্কৃতি। ঐ সব খননের ফলে বেরিয়ে এসেছে সিন্ধু উপত্যকার লিপি, ইস্টার দ্বীপের লিপি এবং এমনি ধরনের আরো সব লিপি– যা আজও পড়া যায় নি এবং যেগুলোর রহস্য জানার জন্য অধীর আগ্রহে তাঁরা অপেক্ষা করছেন জাঁ ফ্রাসোয়া শাপোলিয়ঁ (১৭৯০-১৮৩২) বা হেনরি ক্রেসউইক রলিনসন (১৮১০-১৮৯৫)-এর মতো কোনো পুরাতত্ত্ববিদের। তোমাদের জেনে রাখা ভালো যে, শাপোলিয়ঁ ছিলের ফ্রান্সের লোক। মিশরের প্রাচীন হরফ বাংলা ভাষায় যার নাম চিত্রলিপি ও ইংরেজি ভাষায় যাকে বলা হয় হায়ারোগ্লিফ– পাঠোদ্ধার করে স্মরণীয় হয়ে আছেন তিনি। আর কিউনিফর্ম লিপিতে লেখা প্রাচীন ফার্সি, ইলামাইট ও বেবিলনীয় ভাষার পাঠোদ্ধার করে অমর হয়ে আছেন রলিনসন।

প্রাচীন মিশরের পাঁথরের তৈরি মূর্তি

প্রথম দিককার প্রত্নতত্ত্ববিদেরা ছিলেন অনেকটাই আনাড়ি। প্রাচীন কীর্তি উদ্ধারের নামে তাঁরা অপটু হাতে ব্যবহার করেছেন বড় বড় চিমটা, সাঁড়াশি, বিশাল বিশাল হাতুড়ি, গাঁইতি ইত্যাদি। ধ্বংসাবশেষ উদ্ধারের চাইতে তাঁদের মূল কাজ ও লক্ষ্য ছিল ওগুলোর মধ্যে চাপা পড়ে থাকা ধন-সম্পদ লুটপাট করা। হেনরিক শ্লিমানও, যিনি পরবর্তীকালে প্রত্নতত্ত্ববিদ হিসেবে জগৎ-জোড়া সুনাম ও যশ অর্জন করেছিলেন, ট্রয়নগরী খোঁড়ার সময় যদি তাঁর সামনে কোনো দেয়ালও পড়ত তা তিনি ভেঙে পথ করে নিতে দ্বিধাবোধ করেন নি। মিশরের বিখ্যাত পিরামিডগুলো খোঁড়ার সময় প্রথম প্রথম শাবল, গাঁইতি, বিরাট বিরাট হাতুড়ি, এমনকি ডিনামাইট পর্যন্ত ব্যবহার করা হয়েছিল যাচ্ছেতাই ভাবে।

বর্তমানকালে প্রত্নতাত্ত্বিক খনন কাজে অবশ্যি বাছ-বিচার, হিসেব-নিকেশের উন্নত কায়দা ও কলাকৌশল

facebook/@maktabatuttalamij

ব্যবহৃত হচ্ছে। কবরখানা, সমাধিস্থল, মন্দির ও ঘরের ভিতকে 'ভাঙো ও ধ্বংস করো' প্রত্নতত্ত্ববিদদের মান্ধাতা আমলের এই রীতিনীতি আজকাল আর চলে না। তার বদলে এ-বিদ্যায় দক্ষ, পটু ও পারদর্শী ব্যক্তিরা মিলেমিশে যত্ন ও ধৈর্যসহকারে কাজ করে যাচ্ছেন। আগে যার যা খুশি প্রত্নস্থান খুঁড়ে ভেঙ্গে একেবারে তছনছ করে ফেলত। এখন অন্তত সেটি আর হতে পারছে না। আজকাল প্রতিটি খনন কাজ করতে হয় নির্দিষ্ট আন্তর্জাতিক নিয়মকানুন ও চুক্তি অনুসারে। ঘাগু 'কবর ডাকাত' ছাড়া বর্তমানে আর কবর ডাকাত নেই বললেই চলে। এখনকার দিন হলে কিন্তু এথেন্স থেকে 'এলগিন পাথর' (Elgin Marble) সরিয়ে গ্রেট ব্রিটেনে নিয়ে যাওয়া অত সহজ ছিল না।

অ্যাসেরীয় সভ্যতার নিদর্শন

টমাস ব্রুস ছিলের ইংল্যান্ডের এলগিন নামক স্থানের সপ্তম আর্ল অর্থাৎ সপ্তম জমিদার। ১৭৯৯ সাল থেকে ১৮০২ সাল পর্যন্ত তিনি ছিলেন কন্‌সটান্টিনোপলে ব্রিটিশ সরকারের দূত। তিনি তুরস্ক সরকারের অনুমতি নিয়ে অনেক 'ক্ল্যাসিকাল' (গ্রিক ও রোমান) শিল্পসামগ্রী (যা তাঁর পদবি অনুসারে 'এলগিন মার্বল' নামে পরিচিত) এথেন্স থেকে সরিয়ে ফেলেছিলেন এবং নিজের দেশ গ্রেট ব্রিটেনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এক সময় লর্ড এলগিনের চাকরির মেয়াদ শেষ হল এবং তিনি দেশে ফিরে এলেন। রবার্ট ব্রুস এলগিন পাথর অন্যায়ভাবে সরিয়েছেন বলে দেশে তাঁর বিরুদ্ধে সমালোচনার ঝড় ওঠে। ঐ অন্যায় কাজের জন্য শেষ পর্যন্ত টমাস ব্রুসকে খেসারত দিতে হয় এবং তাঁর সংগৃহীত শিল্প-সামগ্রীগুলোকে খুব কম মূল্যে ব্রিটিশ মিউজিয়ামকে দিয়ে দিতে হয়।

যা হোক, আনাড়ি লোককে দিয়ে শরীরের শক্তি খাটিয়ে প্রত্ন নিদর্শনগুলো খুঁড়ে বের করার ফলে অনেক সময় মূল্যবান প্রত্নসামগ্রীর বেশ ক্ষতি হয়েছে, কোনো কোনো পুরাকীর্তি চিরতরে হারিয়েও গেছে। এখনো যেগুলো অবশিষ্ট আছে, সেগুলো যদি ধৈর্য ধরে, যত্ন নিয়ে ও বুদ্ধি খাটিয়ে মাটির ওপর তোলা যায়; তবে অনায়াসে বলা যায় যে, নানা প্রকার বিধিনিষেধ ও অসুবিধা সত্ত্বেও প্রত্নতত্ত্ব বিষয়টি আজো একটি লোভনীয় ও উত্তেজনাপূর্ণ কাজ বটে। শেষ কোদালের খোঁড়া মাটি দেখার সৌভাগ্য, হাজার হাজার বছর আগের বন্ধ সোঁদা সোঁদা কবর খুলে দেখার প্রবল আকর্ষণ ও কৌতূহল এবং ঐ কবরে পাওয়া মালামালের রহস্য উদ্ধার ও আবিষ্কার– সবই কিন্তু আজো আগের মতোই মনে শিহরণ জাগায়।

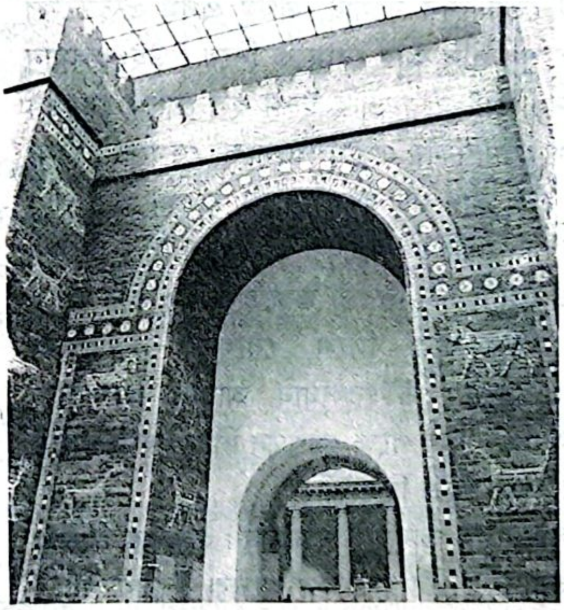

বেবিলনের ইস্তার গেট

প্রত্নতত্ত্ব বর্তমানে এমন একটি অসাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে, যার মধ্যে যেমন লুকিয়ে আছে প্রাচীন ইতিহাসের নানা বিচিত্র সব কাহিনী, তেমনি তার মধ্য থেকে পাওয়া যায় রহস্যময় অতীতের নানারূপ অজানা সৌন্দর্য ও রূপমাধুর্য।

facebook/@maktabatuttalamij

প্রত্নতত্ত্বের জনক

জার্মানির এক গরিব চর্মকারের ছেলে।

অমনি হয়তো তোমরা বলে উঠবে : ওহ্ বুঝেছি, আপনি জার্মানির হের হিটলারের কথা বলতে চাইছেন।

হের হিটলার তো ছিলেন এই সেদিনের মানুষ। আমি আজ যাঁর কথা বলতে চাই, তিনি জন্মেছিলেন হিটলারের জন্মের অনেক আগে। ১৭১৭ সালের ৯ই ডিসেম্বর তারিখে। জার্মানির স্তাঁদাল নামে একটি জায়গা। সেটিই ছিল তাঁর জন্মস্থান। আর তাঁর নাম ছিল জোহান জোয়াশিম উইংক্ল্মান।

প্রথমে তিনি বার্লিনের এক কুস্তির আখড়ায় ভর্তি হয়েছিলেন শরীরটাকে গড়ে তুলতে। তারপর ভর্তি হয়েছিলেন সাল্সওয়েভেল নামক এক জায়গায় এক বিদ্যালয়ে। কিন্তু হঠাৎ-ই তাঁর মতের পরিবর্তন হল। ধর্মের প্রতি তাঁর দেখা দিল গভীর অনুরাগ। তাই এবার তিনি ধর্ম শিক্ষার জন্য ভর্তি হলেন গিয়ে হালে নামক এক স্থানের একটি স্কুলে। লেখাপড়ার প্রতি তাঁর ছিল দারুণ উৎসাহ। এক সময় হালের স্কুলের লেখাপড়া শেষ করলেন তিনি। তারপর তিনি দেশের বিভিন্ন জায়গার বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করে সময় কাটাতে লাগলেন। কিন্তু শিক্ষকতায় মন তাঁর ভরল না।

জার্মানির ড্রেসডেন নামক স্থানের কাছে নথনিট্জ নামের আর একটি জায়গা। এখানকার বুনৌ নামের জায়গায় ছিলেন এক কাউন্ট। কাউন্টের ছিল একটি চমৎকার লাইব্রেরি। বিদ্যাচর্চার প্রতি আগ্রহ দেখে তিনি উইংক্ল্মানকে তাঁর লাইব্রেরির সেক্রেটারি নিযুক্ত করেন। এবার উইংক্ল্মান সাধ মিটিয়ে পড়াশোনো করার সুযোগ পেলেন। এই লাইব্রেরিতে বসে প্রাচীন সাহিত্য ও ইতিহাস পড়তে পড়তে একদিন নিজের অজান্তেই তিনি ঝুঁকে পড়েন প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ের দিকে। তাঁর কাছে ধরা দেয় এক অজানা বিজ্ঞানের মহা মূল্যবান জগৎ।

জোহান জোয়াশিম উইংক্ল্মান

আগেই তোমাদের বলেছি, প্রথম প্রথম প্রত্নতত্ত্বের কারবার ছিল শুধু গ্রিস আর রোমকে নিয়ে। উইংক্ল্মান তা জেনেছেন। তাই তাঁর ভারি ইচ্ছা হল রোমে যেতে। নিজের চোখে সেখানকার প্রত্নসম্পদগুলো দেখতে। কিন্তু ইচ্ছা হলেই তো আর হুট করে রোমে যাওয়া যায় না। নতুন জায়গা। অপরিচিত পরিবেশ। সেখানে গিয়ে রুজি-রোজগারেরও তো একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তার ওপর রোম ছিল তখনকার দিনে রোমান ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বীদের কেন্দ্র। উইংক্ল্মান আবার ক্যাথলিক ছিলেন না। অতএব তাঁর পক্ষে সেখানে গিয়ে রোজগারের পথ বের করা অত সহজ ছিল না।

উইংক্ল্মান বড় ভাবনায় পড়লেন। প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে তিনি কাজ করবেন, এটা যে তাঁর অনেক দিনের সাধ। তিনি স্থির করলেন রোমে তাঁকে যেতেই হবে। দরকার

facebook/@maktabatuttalamij

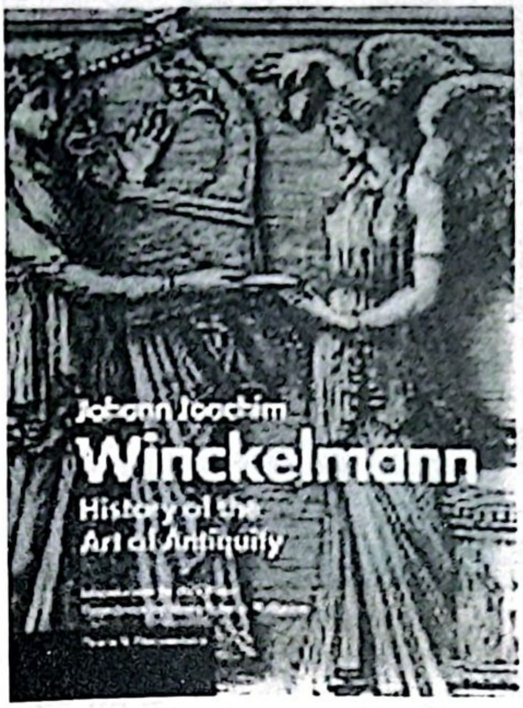

হিস্টরি অব দি আর্ট অব এন্টিকুইটি

হলে তিনি ধর্ম বদলাবেন, তবু রোমে যাওয়ার আশা তিনি ছাড়বেন না। উইংক্‌ল্‌মান মন থেকে দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে দিলেন। চিন্তা করলেন, ক্যাথলিক ধর্ম গ্রহণ করলে রোমে যাওয়া সহজ হবে, চাই কি একটা কাজ যোগাড় হওয়াও হয়তো কঠিন হবে না। তাছাড়া মনপ্রাণ দিয়ে পুরাতত্ত্ব বিষয়ে কাজ চালিয়ে যেতে পারবেন, এই আশায় বুক বেঁধে তিনি ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করলেন। সে ১৭৫৪ সালের কথা। ক্যাথলিক হওয়ার পর সত্যি সত্যি তাঁর আশা পূরণ হল। তিনি রোমে কার্ডিনাল পাসিনির লাইব্রেরির লাইব্রেরিয়ান পদে নিযুক্ত হলেন। উইংক্‌ল্‌মানের মনে আর আনন্দ ধরে না।

এর আগেই অবশ্যি প্রত্নতত্ত্বের কাজ শুরু হয়েছিল ইতালিতে। ১৭১১ সালে হারকিউলেনিয়ামে আবিষ্কৃত হয়েছিল মানুষের প্রথম মূর্তি। পম্পেই শহরে কাজ শুরু হয়েছিল ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে। আর খোঁড়াখুঁড়ির ফলে হারকিউলেনিয়াম থেকে মাটির তলায় পাওয়া গিয়েছিল কতকগুলো পুরনো প্যাপিরাস।

১৭৫৮ এবং ১৭৬২ সাল। উইংক্‌ল্‌মান খনন করা ঐ সব এলাকা নিজের চোখে দেখার জন্য বেরিয়ে পড়েন। দেখেন এবং ভারি মুগ্ধ হন। ভ্রমণ থেকে ফিরে এসেই ১৭৬২ সালে লিখে ফেলেন হারকিউলেনিয়াম সম্বন্ধে একখানি বই। বইখানির নাম দেন 'অন দি ডিসকভারিজ অ্যাট হারকিউলেনিয়াম'। এর দুই বৎসর পর ১৭৬৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি রচনা করেন প্রাচীন শিল্পকলার ইতিহাস সম্পর্কিত আরো একখানি বই। বইখানির নাম দেন 'হিস্টরি অব দি আর্ট অব এন্টিকুইটি'।

গ্রিস ও রোমের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে তিনি দেখেছিলেন শিল্পকলা ও চারুকলার অপূর্ব সব নিদর্শন। নির্মাণ কৌশল আর শিল্পরীতি অনুযায়ী তিনি এগুলোর শ্রেণীবিভাগ করেছিলেন। শিল্প-সামগ্রীগুলোকে এমনভাবে শ্রেণীবিন্যাস উইংক্‌ল্‌মানের আগে আর কেউ করেছিলেন বলে জানা যায় না। এই বইখানিই তাঁর সেরা রচনা।

দেখতে দেখতে উইংক্‌ল্‌মানের নাম ও খ্যাতি সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। ১৭৬৮ সালে উইংক্‌ল্‌মান যান ভিয়েনায়। সেখানে তিনি পান রাজপুত্রের সম্মান। ভিয়েনার রানী থেরেসা তাঁকে দেন অনেক উপহার। ঐ সব উপহারের মধ্যে ছিল তিনটি সোনার মূল্যবান মেডেল। ঐ মেডেল তিনটিই যে তাঁর কাল হবে, তিনি কি তা কখনো ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পেরেছিলেন?

উইংক্‌ল্‌মান নদী পথে রোমে ফিরবেন বলে ভিয়েনা থেকে চলে

পম্পেই নগরীর পাথরের মূর্তি

facebook/@maktabatuttalamij

এলেন ত্রিয়েস্ত নামক শহরে। রাত কাটাবেন বলে উঠলেন গিয়ে এক হোটেলে। সেই দিনই সন্ধ্যার দিকে তাঁর ঘরে ঢুকল এক লোক। বড় ভালো মানুষের মতো দেখতে চাইল রানীর কাছ থেকে উপহার পাওয়া সোনার মেডেল তিনটি। লোকটির নাম ছিল আরকেনজেলি। সে ছিল এক ঘাগু আসামি। অন্যদিকে উইংক্‌ল্‌মান ছিলেন অতি সহজ-সরল মানুষ। লোকটি শুধু মেডেল তিনটি দেখতে চায়, দেখালে ক্ষতি কি? তিনি কি আর জানতেন যে, স্বয়ং আজরাইল এসে উপস্থিত হয়েছে তাঁর সামনে? তিনি মোটেও বুঝতে পারেন নি যে, নিজের জীবন দিয়ে এর ক্ষতিপূরণ করতে হবে তাঁকে। উইংক্‌ল্‌মান যেই বাক্স খুলে মেডেল বের করতে যাবেন, অমনি লোকটা তাঁর গলায় পরিয়ে দিল এক মরণ ফাঁস। ফাঁসটি শক্ত হয়ে বসে গেল তাঁর গলায়। একটা টু শব্দ পর্যন্ত করতে পারলেন না তিনি। এতেও খুশি হতে পারে নি আরকেনজেলি। ছুরি দিয়ে একবার নয়, দু'বার নয়, পরপর আঘাত হানল সাত বার। রক্তে ভেসে গেল ত্রিয়েস্তের সেই হোটেল কক্ষ। উইংক্‌ল্‌মান ঢলে পড়লেন মৃত্যুর কোলে। সেদিন ছিল ৮ই জুন ১৭৬৮ সাল। আজ থেকে প্রায় আড়াই শ' বৎসর আগের কথা। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্তর একান্ন বৎসর। উইংক্‌ল্‌মানের মৃত্যুর সংবাদে সারা ইউরোপ শোকে অভিভূত হয়েছিল।

উইংক্‌ল্‌মান যখন লেখক

উইংক্‌ল্‌মান মারা গেছেন বটে, কিন্তু তাঁর লেখা বই থেকে পরবর্তী কালের প্রত্নতত্ত্ববিদেরা পেয়েছেন পম্পেই ও হারকিউলেনিয়ামের অতুল প্রত্নতাত্ত্বিক সম্পদের কথা। তাঁরা প্রেরণা পেয়েছেন এবং প্রভাবিত হয়েছেন তাঁর রচনা থেকে। তাঁর কাছ থেকেই তাঁরা পেয়েছিলেন মানুষের অতীত ইতিহাস খুঁজে বের করার উৎসাহ ও অনুপ্রেরণা। সকলে তাঁকে মান্য করে প্রত্নতত্ত্বের গুরু হিসেবে। এই জন্য উইংক্‌ল্‌মানকে বলা হয় প্রত্নতত্ত্বের জনক। সারা বিশ্বের প্রত্নতত্ত্ববিষয়ক সংস্থাগুলো এবং পুরাতত্ত্বপ্রেমিকেরা প্রতি বৎসর তাঁর জন্মদিন ৯ই ডিসেম্বর 'উইংক্‌ল্‌মান দিবস' রূপে পালন করে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে এবং নিজেরা ধন্য হয়।

হারকিউলেনিয়াম নগরীর ধ্বংসাবশেষ

facebook/@maktabatuttalamij

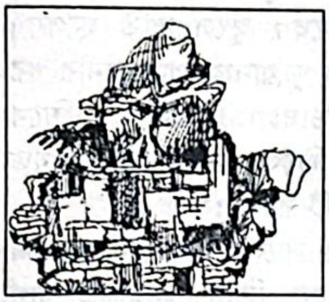

ট্রয়নগরী খুঁড়ে বের করলেন যিনি

লোকটির নাম হেনরিক শ্লিমান। বিচিত্র তাঁর জীবন কাহিনী। অসাধারণ ছিল তাঁর ধৈর্য, সাহস ও মনোবল। তিনি জন্মেছিলেন জার্মানির মেকলেন বার্গ-শেরিনের নিকট বাকনাউ নামক এক স্থানে। সে ১৮২২ সালের কথা। আজ থেকে প্রায় দু শ' বছর আগে। হেনরিকের বাবা ছিলেন একজন গরিব ধর্মযাজক।

বাবা ছোটবেলায় তাঁকে ট্রয়ের গল্প বলতেন। অনেক অনেক দিন আগে ট্রয় নামক এর নগরে এক ভয়ানক যুদ্ধ হয়েছিল হেলেন নামের এক সুন্দরী মহিলাকে কেন্দ্র করে। তোমরা কি গ্রিক কবি হোমারের নাম শুনেছ? অনেক অনেক দিন আগের কথা। তিনি ট্রয়ের ঐ ভয়াবহ যুদ্ধের কাহিনী নিয়ে লিখেছিলেন ওডেসি ও ইলিয়াড নামের দু'খানি মহাকাব্য। বাংলা ভাষায়ও ঐ বই দু'খানির অনেক অনুবাদ রয়েছে। পড়লে তোমরা জানতে পারবে সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধের কাহিনী।

হেনরিক শ্লিমান

হেনরিকের বাবা তাঁকে ট্রয়-যুদ্ধের গল্প শোনাতেন। ছেলে সেই গল্প গভীর মনোযোগ দিয়ে শুনত। হেনরিকের বয়স তখন মাত্র আট বৎসর। ঐ সময় তাঁর বাবা তাঁকে উপহার দিয়েছিলেন একখানি ইতিহাসের সচিত্র বই। বইখানির নাম ছিল 'ইউনিভার্সাল হিস্টরি' অর্থাৎ পৃথিবীর ইতিহাস। বইখানির মধ্যে খোদাই করা ছিল একখানি ছবি। ছবিখানিতে আঁকা ছিল কীভাবে গ্রিক দেবতা আনচিসেস ও গ্রিক দেবী এফ্রোডাইটের পুত্র এনিয়াস ট্রয় থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন। ছবিখানি হেনরিকের মনে গভীর দাগ কেটেছিল।

হেনরিকের বাবা তাঁকে বার বার বলেছিলেন : ঐ কাহিনী তো অনেক অনেক দিনের পুরনো। এত দিন পর ট্রয় নগরীর কোনো চিহ্ন কি আর এখন আছে? এই দীর্ঘ দিনে নিশ্চয়ই সব মাটির সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

ছোট হেনরিক ভাবতেন, এত বড় একটা শহর, তার পুরোটাই ধ্বংস হয়ে যাবে, একেবারে কোনো চিহ্নই থাকবে না? না, না, কিছুতেই এমনটি হতে পারে না। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল, নিশ্চয়ই সেখানে তখনো রয়ে গেছে কিছু না কিছু ধ্বংসের শেষ চিহ্ন। হেনরিক সেদিন পণ করেছিলেন, বড় হয়ে তিনি একদিন খুঁড়ে বের করবেন ট্রয় নগরীর ধ্বংসের স্থানগুলো। সেদিন সকলেই তাঁর কথা হেসেই উড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু বাকনাউ নামক স্থানে মিনাইক নামে ছিলেন এক মিল মালিক। তাঁর ছিল দুই কন্যা। তারা তাঁকে এ কাজে দারুণ উৎসাহ দিতে লাগল।

ট্রয় নগরী

কিন্তু এ কাজে সফল হতে হলে তাঁর তো জানা দরকার ল্যাটিন ভাষা। তিনি তো ও ভাষার কিছুই জানেন না। ল্যাটিন ভাষা তাঁকে

facebook/@maktabatuttalamij

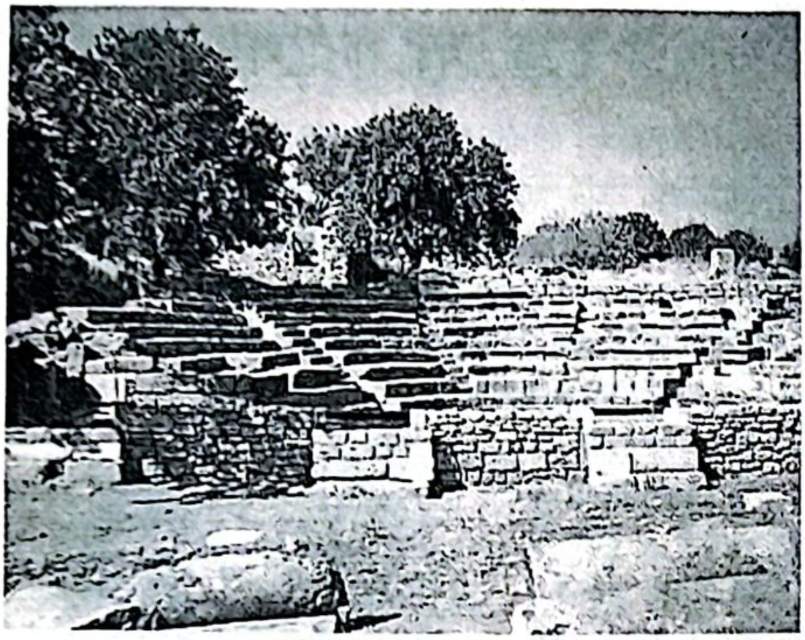

ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া ট্রয় নগরীর একটি মুক্তমঞ্চ

শিখতেই হবে। স্কুলে ভর্তি হলেন। কয়েক বছর পুরোদমে পড়াশুনোর পর ল্যাটিন ভাষা চমৎকার শিখে ফেললেন। লিখে ফেললেন ট্রয়ের যুদ্ধ সম্বন্ধে একটি রচনা।

১৮৩৬ সালের কথা। মাত্র চৌদ্দ বৎসর বয়সে তিনি কারস্টেনবার্গ নামক জায়গায় একটি ছোট্ট মুদিখানায় শিক্ষানবিস হলেন। কী ভীষণ খাটুনি! ভোর পাঁচটা থেকে রাত এগারোটা– পুরো আঠারো ঘণ্টা হাড় ভাঙা অমানুষিক পরিশ্রম! তবু তিনি এখানে কাটিয়ে দিয়েছিলেন সাড়ে পাঁচটি বৎসর। মুদিখানায় কাজ করত আরো একজন শিক্ষানবিস। মহাকবি হোমারের মূল কবিতা পানির মতো মুখস্থ বলতে পারতেন তিনি। তাঁর সঙ্গে হেনরিকের ভাব হতে দেরি হয় নি। হেনরিক লিখে গিয়েছেন, 'আমি ঐ কবিতার এক বর্ণও বুঝতাম না, কিন্তু শব্দের মধুর ঝঙ্কার আমার মনে গভীর দাগ কেটেছিল। তিন তিনবার আমি ওঁকে দিয়ে হোমারের অপূর্ব সেই কবিতার পংক্তিগুলো আউড়িয়ে নিয়েছিলাম।'

ঐ মুদিখানায় আর কত! তিনি হাঁপিয়ে উঠলেন। নতুন কোনো কাজ চাই। ১৮৪১ খ্রিস্টাব্দে মুদিখানার কাজে ইস্তফা দিলেন। যোগদান করলেন কেবিন বয় হিসেবে এক জাহাজের চাকরিতে। কেবিন যাত্রীদের ফাইফরমাস খাটাই ছিল তাঁর কাজ। ইউরোপ মহাদেশের উত্তরে অবস্থিত নর্থ সী। জাহাজখানা একদিন সেখানে বিধ্বস্ত হল। জাহাজের সব যাত্রী মারা গেল। ভাগ্যক্রমে বেঁচে গেলেন শ্লিমান।

পরের বৎসরেই অর্থাৎ ১৮৪২ সালে তিনি নেদারল্যান্ড দেশের আমস্টারডামে কেরানির চাকরি পেয়ে গেলেন। ভাষা শেখার কাজে তাঁর ছিল বেজায় ঝোঁক। সুযোগও পেয়ে গেলেন তিনি। এ সুযোগ হাতছাড়া হতে দিলেন না। ভাষা শেখার কাজে গভীরভাবে মনোযোগ দিলেন। চটপট শিখে ফেললেন ইংরেজি, ফরাসি, ওলন্দাজ, স্পেনিশ, ইতালীয় এবং পর্তুগিজ ভাষা। এতেও তাঁর ভাষা শেখার আগ্রহে ভাটা পড়ল না। ১৮৪৪ সালে তিনি শিখে ফেললেন রুশ ভাষাও। এর দুই বৎসর পর ১৮৪৬ সালে তিনি তাঁর নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরূপে চলে গেলেন রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে। কিন্তু সেখানে তাঁর মন বসল না। তাই এ কাজ তিনি ছেড়ে দিলেন। পাড়ি জমালেন আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার উদ্দেশে। সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হলেন। ১৮৫০ সালে হলেন ব্যাংকের মালিক। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট তাঁকে সাদরে অভ্যর্থনা জানালেন। নীলের ব্যবসা করে চার বৎসরের মধ্যে অর্থাৎ ১৮৫৪ সালেই তিনি কোটিপতি বনে গেলেন।

তখনো কিন্তু ভাষা শেখার সাধ তাঁর মেটে নি। এরই মধ্যে তিনি শিখে ফেলেছেন সুইডিশ (সুইডেনের) আর পোলিশ (পোল্যান্ডের) ভাষা এবং ১৮৫৬ সালে শিখে নেন আধুনিক ও প্রাচীন গ্রিক ভাষা। ল্যাটিন ভাষা আগেই শিখে নিয়েছিলেন। তা আরো ভালো করে ঝালিয়ে নিলেন। এ ভাষায় তাঁর দখল আরো পোক্ত হল। ১৮৬৩ সালে শিখে নেন আরবি ভাষা। তারপর তিনি বেরিয়ে পড়েন বিশ্বভ্রমণে।

১৮৬৬ সালেই হেনরিক কোটি কোটি টাকার মালিক হয়ে যান। আর আমেরিকা নয়। এবার তিনি প্যারিসে স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন বলে স্থির করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণরূপে প্রত্নতত্ত্বের কাজে

facebook/@maktabatuttalamij

নিজেকে নিয়োজিত করা। এই সময় চীন ও জাপান সম্পর্কে তাঁর একখানি ভ্রমণমূলক বই প্রকাশিত হয়। এরপর ১৮৬৮ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ক আর একখানি বই। বইখানির নাম 'ইথাকাঃ আর্কিয়জিক্যাল ইনভেস্টিগেশন্স্ অব হেনরিক শ্লিমান'।

পরের বৎসর, অর্থাৎ ১৮৬৯ সালে তিনি বিয়ে করেন সোফিয়া এনগাসট্রমিনোস নামের গ্রিস দেশীয় এক মেয়েকে। মেয়েটির বয়স তখন মাত্র আঠার বৎসর। আর হেনরিকের বয়স সে সময় উনপঞ্চাশ। সোফিয়ারও পুরাতত্ত্ব বিষয়ে ছিল প্রচুর উৎসাহ এবং ট্রয় নগরীর ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধানের কাজে স্বামীকে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন– যাকে তখন এক অবাক করা কাণ্ডরূপে মনে করা হত।

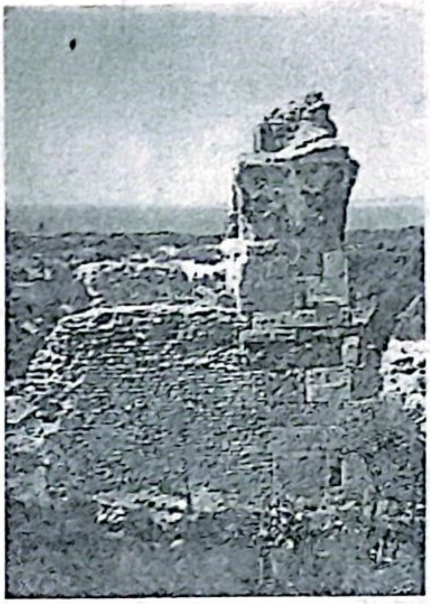

ট্রয় নগরী

যা হোক, শ্লিমান কখনোই ট্রয়ের কথা ভুলতে পারেন নি। ১৮৭০ খ্রিস্টাব্দে তিনি নিজের খরচে ট্রয়ের খনন কাজ শুরু করেন এবং ১৮৭৩ সালে অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ট্রয়নগরী খুঁড়ে বের করেন। সেখানকার যেসব কবর তিনি উদ্ধার করেছিলেন, সেগুলো ছিল অনেকটাই মৌমাছির চাকের মতো দেখতে।

১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ভূমধ্যসাগরের মধ্যে অবস্থিত ক্রিট দ্বীপের মাইসেনি নামক স্থান থেকে খুঁড়ে বের করেন পাঁচটি কবর। এগুলোর মধ্যে একটি কবর ছিল 'এট্রিয়ুসের কবর' নামে প্রসিদ্ধ। এরপর আরকোমোনাস নামক স্থান থেকে খুঁড়ে বের করেন 'মিনিয়াসের ধনাগার, ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে। এর দুই বৎসর পরে, অর্থাৎ ১৮৮২ সালে তিনি কারিগরি সহযোগিতা লাভ করেন হেনরিক উইলহেলম ডরফেল্ড নামক প্রত্নতত্ত্ববিদের। ডরফেল্ড ছিলেন অলিম্পিয়ার সহযোগী খননকারী। ১৮৮৪-৮৫ খ্রিস্টাব্দে শ্লিমান টিরাইন্স নামের এক স্থানের ঐতিহাসিক ধ্বংশাবশেষ খনন করেন। ১৮৯০ সালে আবার তিনি ট্রয়ে ফিরে যান এবং খনন কাজ পরিচালনা করেন। এটি তাঁর জীবনের শেষ খনন কাজ।

হেনরিকের কর্মময় জীবনের অবসান ঘটে ১৮৯০ সালের খ্রিস্ট মাসের পরের দিন, অর্থাৎ ২৬ ডিসেম্বর। নেপল্স্ শহরে। তিনি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ অচেতন হয়ে রাস্তার ওপরই ঢলে পড়েন। অন্যান্য পথচারী তাঁর এ অবস্থা দেখে মহা চিন্তায় পড়লেন। তাঁকে হাসপাতালে নিয়েই বা যাবে কে, আর নিয়ে যাওয়ার ভাড়াই বা দেবে কে? শেষ পর্যন্ত একজন পথচারী ঐ সুবেশী বিদেশিকে চিনতে পারলেন এবং তাঁর সদ্‌গতির ব্যবস্থা করলেন।

এক ডজনেরও বেশি ভাষায় সুপণ্ডিত হেনরিক শ্লিমানের নিজের ওপর বিশ্বাস ছিল অগাধ। আর এই আত্মবিশ্বাসের গুণে তিনি সমসাময়িক পুরাতত্ত্ববিদদের মতামত উপেক্ষা করতে পেরেছিলেন এবং অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছাতে পেরেছিলেন। এই শিল্প অনুরাগী প্রতিভা হোমারের কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিলেন এবং তাঁর সময়কার সকল পণ্ডিতের মতামত অগ্রাহ্য করে আবিষ্কার করেছিলেন ট্রয় নগরীর প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ এবং মাইসেনি থেকে উদ্ধার করেছিলেন এট্রিয়ুস ও তাঁর পুত্র আগামেমননের রাজধানী। ফলে প্রত্নতত্ত্ব বিষয়টির প্রতি সারা পৃথিবীর আগ্রহ ও অনুরাগ যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং ঠিক ঠিক বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পথ সঙ্গে সঙ্গে তৈরি না হলেও ১৮৭৫ সালে গ্রিক ধর্মের কেন্দ্র অলিম্পিয়ায় যে খনন কাজ শুরু হয়েছিল, তার ভিত্তি স্থাপনে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।

হেনরিক বেঁচে নেই; কিন্তু তাঁর দেখানো পথে প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা ও অনুসন্ধানের কাজ আজো এগিয়ে চলেছে। খাঁটি বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের পথ নির্মাণে হেনরিক শ্লিমানের অবদানের কথা আজো লোকেরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

facebook/@maktabatuttalamij

দুটি শহরের ইতিকথা

৭৯ সাল। তখন রোমে রাজত্ব করতেন সম্রাট টাইটাস।

রোজকার মতো সেদিনও সূর্য উঠেছে পুব আকাশে। বিসুভিয়াসের চূড়ার ওপর দিয়ে লম্বা প্লেন গাছের ফাঁক গলে সোনালি রোদের স্নিগ্ধ আলো উঁকি মারছিল শহরের বাড়িগুলোর ওপর। চারদিকে সুন্দর শান্ত পরিবেশ।

তখনো পাখিদের প্রভাতি গান বন্ধ হয় নি। লোকেরা সবে বিছানা ছেড়ে উঠেছে। তৈরি হচ্ছে যে যার কাজে যাওয়ার জন্য। পথে লোকজনের চলাচলও শুরু হয়েছে। দোকানি দোকানের ঝাঁপ খুলছে, চাষি যাচ্ছে খামারে। চারদিক সরগরম, ব্যস্তসমস্ত ভাব।

এমন সময় অগ্নিগিরি বিসুভিয়াসের একটা চাপা গর্জন। সকালের সব শান্তি ভেঙে খান্ খান্ হয়ে গেল। বন্ধ হয়ে গেল প্রভাতি পাখির গান আর কলকাকলি। গোয়ালে বাঁধা গরু-ছাগল ভয়ে ছটফট করে উঠল। শেকলে বাঁধা কুকুর বিপদের আশঙ্কায় কেঁদে উঠল।

বিসুভিয়াসের আর্তনাদ আরো বাড়ল। মনে হল পৃথিবীর ভেতরটা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠছে। থর্ থর্ করে কাঁপছে হারকিউলেনিয়াম আর পম্পেই শহর দু'টি।

ভূমিকম্প! সকলের মুখে একই কথা।

কথাটা বিদ্যুতের বেগে ছড়িয়ে পড়ল শহর দু'টির এক মাথা থেকে আর এক মাথায়। ভয়ে লোকজনের মুখ শুকিয়ে গেল। ঠিক এই লক্ষণগুলোই তারা আরো একবার দেখেছিল। এই তো সেদিন– মাত্র ষোল বৎসর আগে। সে ৬৩ খ্রিস্টাব্দের কথা। আগস্ট মাসের ২০ তারিখ। এত শিগগির তারা কি ভুলতে পারে সেই ভয়ঙ্কর দিনের কথা! এখনো তার চিহ্ন ছড়িয়ে আছে শহর দু'টির এখানে সেখানে।

দেখতে দেখতে বিসুভিয়াসের মাথাটা টুকরো টুকরো হয়ে উড়ে গেল। আগুনের লেলিহান শিখা আর বিষাক্ত ধোঁয়া ছিটকে বেরিয়ে আসতে লাগল বিসুভিয়াসের পেট থেকে। সূর্যের ঝলমলে আলো কেমন যেন নিভু নিভু হয়ে এল। চারদিকে নেমে এল অন্ধকারের কালো পর্দা। বৃষ্টির স্রোত নেমে এল সুজলা-সুফলা ফুলে-ফলে ভরা পম্পেই ও হারকিউলেনিয়াম শহর দু'টির ওপর।

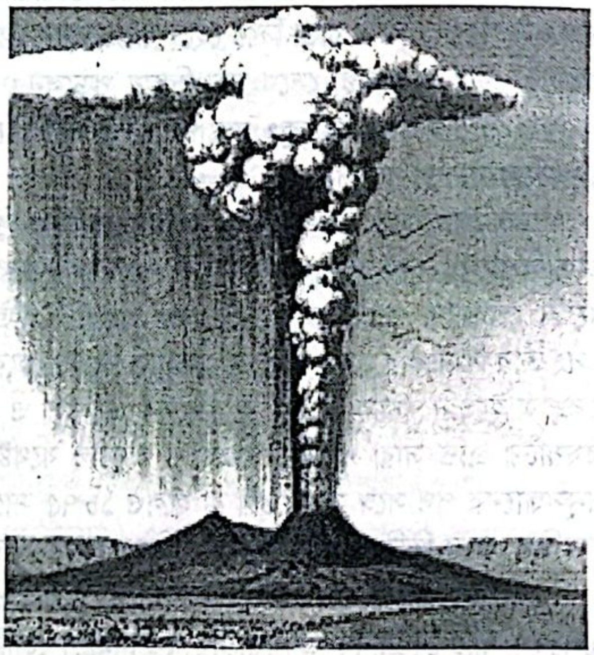

বিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরি

না না, পানির বৃষ্টি নয়– গরম লাভার স্রোত। নেমে এল সমতলভূমির ওপর বিসুভিয়াসের মাথা থেকে। দেখতে দেখতে লাভায় লাভায় ডুবে যেতে লাগল শহর দু'টির পথঘাট, জায়গা-জমিন। উহ্, কী ভীষণ গরম সে লাভা!

হারকিউলেনিয়ামের ব্যস্ত জীবন অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে গেল। চঞ্চলতা থেমে গেল পম্পেই শহরটারও। লাভার সমুদ্রে ঢাকা পড়ল পুরো হারকিউলেনিয়াম শহর। এত বিপুল লাভা পড়ল! কোথাও কোথাও সৃষ্টি হল পঞ্চাশ ফুটের মতো উঁচু লাভার পাহাড়! গরম ছাই আর ছোট ছোট অগ্নিশিলার আবরণে ঢাকা পড়ল সুখী সমৃদ্ধশালী পম্পেই নগরীও।

facebook/@maktabatuttalamij

প্রাচীন হারকিউলেনিয়াম নগরী

ভূমিকম্পের তোড়ে ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে গেল। মানুষের আশ্রয়টুকু পর্যন্ত নেই। তার ওপর একেবারে আগুনের মতো গন্‌গনে গরম লাভা। লোকেদের চোখে আতঙ্কের ছায়া, মুখে হাহাকার। গরম লাভার হাত থেকে বাঁচবার জন্য মাথার ওপর বালিশ চাপিয়ে ছুটে চলল যার যেদিকে দু'চোখ যায়। না, আর চলতেও পারে না তারা। হাত-পা নেতিয়ে পড়ছে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে।

যারা পালাতে পারল না, তারা আশ্রয় নিল ভাঙা দালান-কোঠার মধ্যে। কিন্তু ঘন বিষাক্ত সালফারের ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় ততক্ষণে ছেয়ে গেল শহর দু'টির অলিগলি শতপথ। মা তার কোলের বাচ্চাকে বাঁচাতে গিয়ে আঁকড়ে ধরল বুকের কাছে। শেকলে বাঁধা কুকুরের শেকল ছেঁড়ার সে কী প্রাণপণ চেষ্টা! কিন্তু সব চেষ্টাই ব্যর্থ হল। ধীরে ধীরে যে যেখানে ছিল দম বন্ধ হয়ে মারা গেল।

তিনদিন পর সূর্যের মুখ দেখা গেল। বিসুভিয়াসের চারদিক ঘিরে তখন দেখা গেল শুধু সাদাকালো ছাইয়ের স্তূপ। আর ঐ স্তূপের মধ্যে হারিয়ে গেল পম্পেই ও হারকিউলেনিয়াম নামের দু'টি সমৃদ্ধশালী শহর। দিন যায়, রাত আসে। এমনি করে পার হয়ে গেল শ' শ' বৎসর। এক সময় লোকেরা ভুলে গেল শহর দু'টির কথা।

দীর্ঘ সতের শ' বৎসর পর আবার জেগে উঠল ঘুমিয়ে থাকা শহর দু'টি। নতুন করে জন্ম হল তাদের। প্রাচীন শিল্প-সাহিত্যের প্রতি মানুষের আকর্ষণ বৃদ্ধি পেল এবং ধনবান শিল্প প্রেমিকেরা প্রবল উৎসাহ নিয়ে পুরনো দিনের শিল্প-সামগ্রী সংগ্রহে মনোনিবেশ করলেন।

পম্পেই নগরে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ শুরু হয়েছিল সাজাপ্রাপ্ত আসামিদের নিয়ে। অবশ্যি সফল খনন কাজ প্রথম আরম্ভ হয়েছিল ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে। দিন কয়েক খোঁড়াখুঁড়ির পর ঐ বৎসরেরই ৬ এপ্রিল পাওয়া গিয়েছিল দেয়ালে আঁকা ছবি। আরো আবিষ্কৃত হয়েছিল ব্রোঞ্জের তৈরি ঘোড়ার কিছু অংশবিশেষ। এরপর আবারো পাওয়া গিয়েছিল নানা ধরনের মূর্তি।

খননকাজের দায়িত্ব দেয়া হয়েছিল রোকো গিয়াশিনো দ্য আলকুবিয়ের নামক এক ইঞ্জিনিয়ারের ওপর। তিনি ছিলেন রাজার সৈন্য বিভাগের একজন কর্নেল। কিন্তু অতবড় ইঞ্জিনিয়ার হলে হবে কি, প্রত্নতত্ত্ব বিষয়ে

facebook/@maktabatuttalamij

পম্পেই থেকে উদ্ধার করা শিল্পকর্ম

তিনি একেবারে আনাড়ি। এমন লোকের পাল্লায় পড়লে যা হয়, প্রাচীন মূল্যবান সম্পদগুলোর অবস্থাও তাই-ই হয়েছিল।

৬ এপ্রিলের পর থেকে থেমে থেমে চলেছে খননের কাজ। পম্পেই নগরীর পাঁচ ভাগের তিন ভাগ খুঁড়ে বের করা হয় এবং শিল্পকলার চমৎকার সব নির্দর্শন আবিষ্কৃত হয়। নানা জিনিসের সঙ্গে চুলোর মধ্যে পাওয়া যায় আধাসেদ্ধ খাদ্যবস্তু। ঘরের মেঝের ওপর পাওয়া যায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা টাকা-পয়সা। অবস্থা দেখে মনে হয়, এইমাত্র কোনো খদ্দের হোটেলে খাওয়া-দাওয়া সেরে পাওনা হিসেবে দিয়ে গেছে ঐ মুদ্রাগুলো। শুধু তাই নয়, সেখানে পাওয়া গেছে বেশকিছু নর কঙ্কালও। আধুনিক মানুষের কাছে প্রকাশ পেয়েছে প্রাচীন হারকিউলেনিয়াম ও পম্পেই শহর দু'টির থমকে থাকা শ' শ' বৎসর আগেকার নিত্যদিনের জীবনযাত্রার হালচাল ও তখনকার দিনের অপূর্ব সব শিল্পকর্ম।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪৩ সালের ১ এপ্রিল মিত্রবাহিনীর (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়ন) টহল বিমান পম্পেই শহরের ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল। তাদের মনে হল পম্পেই শহরের ধ্বংসস্তূপের ভেতর জার্মান সাঁজোয়াবাহিনী লুকিয়ে রয়েছে। যেমন ভাবা তেমন কাজ। তারা বোমা ফেলতে শুরু করল। আর ঐ বোমার প্রথমটিই পড়বি তো পড় একেবারে সোজা ফোরামের (মূলত প্রাচীন রোমের বাজার। এখানে চলত সরকারি কাজকর্ম ও বিচারকার্য) ওপর। এতেও খুশি হতে পারে নি মিত্রপক্ষের টহল বিমান। কারণ, ইতালির শাসক বেনিতো মুসোলিনী তখন শত্রুপক্ষ জার্মানির হের হিটলারের পক্ষে ছিলেন। ইতালির রাজধানী রোম। একটি নয়, দু'টি নয় টহল বিমান গুনে গুনে ফেলল দেড়শ'টি বোমা। নিদারুণ ক্ষতি হল রোমের। প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন ও ভবন– যা বহু কষ্ট, অর্থ ও শ্রমের বিনিময়ে উদ্ধার ও নতুন করে গড়ে তোলা হচ্ছিল, তা আবার ধ্বংস হল এবং পুনরায় তা মাটির নিচে চাপা পড়ে গেল।

অগ্ন্যুৎপাতের ফলে পম্পেই শহর ডুবে গিয়েছিল নরম ঝামার নিচে। আর হারকিউলেনিয়াম তলিয়ে গিয়েছিল কঠিন লাভার নিচে। ইমানুয়েল মরিট্স ছিলেন আলবুফ নামক স্থানের রাজকুমার। তার ওপর তিনি ছিলেন জেনারেল। তাঁর শখ হল একটা কুয়া খুঁড়বেন তিনি। তার সে কুয়া খুঁড়বেন তাঁর প্রাসাদেরই কাছে। কিন্তু কুয়া খোঁড়া ও জায়গায় অত সহজ ছিল না। কারণ, জায়গাটা ছিল কাঁকর ও পাথর দিয়ে ভরা। কিন্তু স্বয়ং রাজকুমারের হুকুম। যত কাঁকর আর পাথর থাক খুঁড়তেই হবে কুয়া।

মাটি কাটার কাজ শুরু হল। কিন্তু কাজ এগোয় না। মাটি বেজায় শক্ত। মাটির নিচে কি আছে দেখতে হবে। একটা বুদ্ধি বের করা হল। কাছেই ছিল এক কৃষকের কুয়া। তার ভেতর ঢুকিয়ে দেয়া হল লম্বা লাঠি। জায়গাটা ছিল শহরের ঠিক মধ্যিখানে। মজুরের লাঠিতে কি যেন শক্ত একটা ঠেকল। কাজ বন্ধ করে কোমর টান করে দাঁড়াল মজুরটি।

মৃত পম্পেই নগরীর পেছনে বিসুভিয়াস আগ্নেয়গিরি

facebook/@maktabatuttalamij

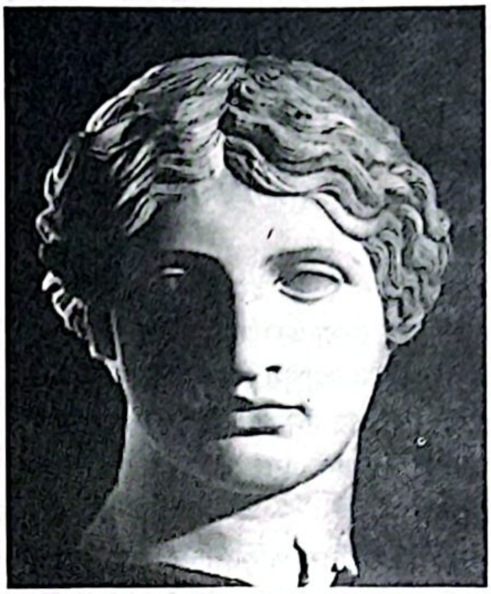

হারকিউলেনিয়াম খননে এমন অনেক পাথরের মূর্তি পাওয়া যায়

ও কিছু নয়। পাথর-টাথর হবে হয়তো। খুঁড়ে যাও। আবার কাজ শুরু হল। খুঁড়তে খুঁড়তে নানা জিনিসের সঙ্গে সত্যি সত্যি বেরিয়ে এল একখানি কারুকাজ করা মার্বেল পাথর। তারপর পাওয়া গেল পুরনো দিনের তিনটি চমৎকার নারী মূর্তি। এগুলোর কোথাও কোথাও নষ্ট হয়ে গেছে; কোনো কোনো অংশ আবার হারিয়েও গেছে। রাজকুমার ভাবলেন, জিনিসগুলো মেরামত করলে হয়তো মূল্যবান হতে পারে। তিনি ওগুলো গোপনে পাঠিয়ে দিলেন রোমে। হাতের কাছে যে কারিগর পেলেন, তাকে দিয়েই কোনোমতে সারিয়ে নিলেন। উপহার দিলেন আর এক রাজকুমারকে। সে রাজকুমারের নাম ছিল ইউজিন। তিনি ঐ মূর্তিগুলোকে সাজিয়ে রাখলেন তাঁর বাগানে। জিনিসগুলো ছিল বেশ পুরনো। আলবুফের রাজকুমারকে অনুরোধ করা হল, তিনি যেন জায়গাটি আর না খোঁড়েন। অতএব কুয়া খোঁড়ার কাজ বন্ধ হল।

এরপর পার হয়ে গেল দীর্ঘ ত্রিশটি বৎসর। ইতোমধ্যে স্পেনের রাজা জয় করে নিয়েছেন নেপল্‌স। রাজা আবার ঐ কুয়া খোঁড়ার হুকুম দিলেন। খুঁড়তে খুঁড়তে লোকেরা পেয়ে গেল কিছু ভাঙাচোরা পুরনো ঘরদোর। সেই কুয়াটি এখনো দেখতে পাওয়া যায়। খাড়া নেমে গেছে হারকিউলেনিয়ামের থিয়েটার ঘরের মধ্যিখানে। আর এখানেই পাওয়া যায় হারকিউলেনিয়ামের নাম লেখা একটি ফলক। কোন জায়গা তারা পেয়েছে, বুঝতে অসুবিধা রইল না। শ্রমিকদের প্রতি নির্দেশ হল– বসে থেকো না। খুঁড়ে যাও।

হারকিউলেনিয়ামের খনন কাজের দায়িত্বও পড়েছিল আলকুবিয়েরের ওপর। খোঁড়াখুঁড়ির সময় তিনি পেয়েছিলেন ব্রোঞ্জের বেশকিছু টুকরা-টাকরা। টুকরাগুলো জোড়া দিয়ে জিনিসটার আসল চেহারা ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব পড়েছিল জোসেফ কানার্ত নামক এক স্থপতির ওপর। কানার্ত টুকরাগুলোর মূল্য বুঝতে পারেন নি। ফলে ওসব টুকরার অনেকগুলোই তিনি গালিয়ে ফেলেছিলেন। তৈরি করেছিলেন গির্জার ঝাড়বাতি ও মেডোনার মূর্তি। পরে অবশ্যি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা বাদবাকি টুকরা উদ্ধার হয়েছিল এবং সেগুলো জোড়া দিয়ে তিনি বানিয়েছিলেন ব্রোঞ্জের একটি চমৎকার ঘোড়া। তোমরা যদি কখনো নেপল্‌স যাও, তবে সেখানকার জাতীয় জাদুঘরে আজো দেখতে পাবে সেই সুন্দর ঘোড়াটি। খুব মনোযোগ দিয়ে না দেখলে বোঝাই যায় না যে, ঘোড়াটি অনেকগুলো ব্রোঞ্জের টুকরো দিয়ে তৈরি।

মন্দিরের দেয়ালে অঙ্কিত এপোলো দেবতা

নেপল্‌স এক সময় ফরাসি অধিকারে চলে যায়। তার রাজা হন নেপোলিয়নের সেনাপ্রধান জেনারেল মুরাত। তাঁর রানী ছিলেন মেরি কেরোলিন বোনাপার্ট। নেপল্‌স রাজদরবারের চিত্রশিল্পী ছিলেন ফ্রাঁসোয়া মাজোই। তিনি জন্মেছিলেন ১৭৮৩ খ্রিস্টাব্দে। 'দি রুইন্‌স অব পম্পেই' নামক একখানি বই লিখেছিলেন তিনি। পম্পেইর ধ্বংসাবশেষের

facebook/@maktabatuttalamij

পম্পেই শহরে প্রাপ্ত আলোক বাতি

প্রতি তাঁর ছিল গভীর মমতা। রাজা-রানীর মধ্যেও তিনি এই মমত্ববোধ জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন এবং এখানকার খনন কাজের জন্য আর্থিক সাহায্য দিতেও রাজি করিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য বলতে হবে, যে সময় তিনি প্যারিসে ঐ ধ্বংসস্তূপের ছবি প্রকাশনার কাজে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় নেপোলিয়ন ফ্রান্সের সিংহাসন থেকে অপসারিত হন। মুরাতকে গুলি করে হত্যার নির্দেশ দেয়া হয়। নেপোলিয়ন-ভক্ত মাজোই যাতে নেপল্‌স ফিরে যেতে না পারেন, সেজন্য তাঁকে পাসপোর্ট দেয়া হল না। কিন্তু তাঁকে যে তাঁর প্রিয় নেপল্‌সে ফিরে যেতেই হবে। ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি এক কৌশলের আশ্রয় নিলেন। নেপল্‌সের বুরবন রাজকুমার ছিলেন নেপোলিয়নের সমর্থক। তিনি কাজের জন্য পোপের নিকট আবেদন করেন। রাজকুমারের আবেদনপত্রটি বয়ে নিয়ে যাওয়ার সুযোগ মাজোই নিজেই গ্রহণ করেন এবং পরে তিনি পোপের সম্মানিত দূতরূপে তাঁর প্রিয় ধ্বংসস্তূপের মধ্যে ফিরে যেতে সমর্থ হন।

১৭৫৩ সালের কথা। হারকিউলেনিয়ামের এক বাড়িতে পাওয়া যায় লা-ওয়ারিশ পাণ্ডুলিপির এক গোপন ভাণ্ডার। বাড়িটি ছিল তখনকার দিনের বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক ফিলোডেমাসের। পাণ্ডুলিপিগুলো ছিল প্যাপিরাসের। প্যাপিরাসগুলো বাড়ি বা ভিলার মধ্যে পাওয়া গিয়েছিল বলে তাদের নাম দেয়া হয়েছিল 'ভিলা দ্য প্যাপাইরি'। প্যাপিরাসগুলো পুড়ে কালো হয়ে গিয়েছিল এবং একটার সাথে অন্যটা আঠার মতো লেপটে গিয়েছিল। সেগুলো পড়াও প্রায় অসম্ভব হয়েছিল। ক্যামিলো প্যাদার্নি নামের এক লোক সেগুলোর পাঠোদ্ধারের কাজে লেগে গেলেন। হাতের আস্তিন গুটিয়ে কোমরে গামছা বেঁধে বিরাট এক কাঁচি হাতে নিয়ে জোরেশোরে কাজ শুরু করলেন। খচাখচ এমন কাটাটাই কাটলেন যে, প্যাপিরাসগুলো কুচি কুচি হয়ে গেল। তখন ওগুলোকে ফেলে না দিয়ে উপায় রইল না।

আর এক ভদ্রলোক কিন্তু কাজ শুরু করেছিলেন ভিন্নভাবে। তাঁর নাম ছিল এন্টোনিও পিয়াগিয়ো। তিনি ছিলেন একজন খ্রিস্টান পাদরি। ইতালির বাইরে তাঁকে প্রায় কেউই চিনত না। শুধু উইংক্‌ল্‌মান তাঁর সম্বন্ধে লিখেছিলেন : তিনি এক যন্ত্র আবিষ্কার করেছিলেন এবং ঐ যন্ত্রের সাহায্যে খুব কম ক্ষতি করে তিনি অনেক লেপটে যাওয়া প্যাপিরাস খুলেছিলেন।

পম্পেইয়ে প্রাপ্ত পিলার

আধুনিক খননকাজ শুরু হয়েছিল ১৮৬১ সালে গিওসেপ ফিরেলির নেতৃত্বে। ১৮৪৮ সালে ফরাসি বিপ্লবের সময় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। জেলখানায় বসে বসে তিনি পম্পেইয়ের কাহিনী লেখেন। জেল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর কাজ নেই কর্ম নেই পথে পথে ঘুরে বেড়ান। শেষ পর্যন্ত তিনি পম্পেইয়ের খনন কাজের পরিচালক হয়েছিলেন এবং খনন বিষয়ে জরুরি নিয়মনীতি চালু করেছিলেন। তিনি প্রত্নস্থানে শুধু খোঁড়াখুঁড়ির কাজই করেন নি; প্রাচীন কীর্তিসমূহের সুরক্ষার ব্যবস্থাও করেছিলেন।

প্রত্নতাত্ত্বিক কাজকে অধ্যাপক আমাদেও মাউরি পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি ১৯১১ সাল থেকে পম্পেই ও হারকিউলেনিয়ামে খনন ও গবেষণা কাজ পরিচালনা করেছিলেন। তিনি অনেক মূল্যবান আবিষ্কার করে গিয়েছেন এবং তাদের যথাযথ বিবরণ লিখে রেখে গিয়েছেন।

facebook/@maktabatuttalamij

সার্কাস-খেলোয়াড় থেকে পুরাকীর্তি সংগ্রহকারী

প্রাচীনকালে মিশরের রাজাদের বলা হত ফারাও। আর আমাদের দেশে বলা হত ফেরাউন। মৃত্যুর পর ফেরাউনদের যেখানে কবর দেয়া হত, তাঁর নাম ছিল পিরামিড। প্রাচীন পৃথিবীর সাতটি আশ্চর্য জিনিসের মধ্যে পিরামিড ছিল একটি। রাজার মৃতদেহের সঙ্গে কবরে দেয়া হত পৃথিবীতে বেঁচে থাকবার সময় তিনি যে সব মূল্যবান জিনিস ব্যবহার করতেন, তার সব কিছু- সোনার থালাবাসন, খাট-পালং, সোনার গাড়িজুড়ি, চাকর-বাকর, দাস-দাসী এবং আরো কত কি। কবর-ডাকাতেরা এক সময় বুঝতে পারল, পিরামিডের ভেতরে রয়েছে বিপুল মূল্যবান ধনসম্পদ। তখন তারা পিরামিড ভেঙে তার ভেতর ঢুকতে লাগল ঐসব দামি দামি ধন-সম্পদের লোভে। দেশ-বিদেশ থেকে ভাগ্যান্বেষী লোকজন আসতে লাগল পিরামিডের ভেতরকার ধন-সম্পদ লুট করতে।

এমনি একজন ভাগ্যান্বেষী লোক ছিলেন ইতালি দেশের গিওভানি বাতিস্তা বেলজনি। তিনি জন্মেছিলেন আজ থেকে সোয়া দুই শ' বছর আগে ১৭৭৮ খ্রিস্টাব্দে। ইতালির পদুয়া নামক একটি শহরে। বেলজনি ছিলেন খুব গরিব মানুষ। আর ছিলেন বড়ই অস্থির প্রকৃতির লোক। তিনি ইতালির রাজধানী রোমে মঠবাসী ভিক্ষু হতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছায় যেন বাধ সেধেছিলেন ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। তাঁর নেতৃত্বে ফরাসি সৈন্যরা ইতালি আক্রমণ করে বসল। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে বেলজনি প্রাণভয়ে পালিয়ে গেলেন ইউরোপের উত্তরে আর একটি দেশ হল্যান্ডে। বেলজনি নিজের দেশ ইতালি, তারপর প্রায় সারা ইউরোপ ছুটে বেড়িয়েছেন একটি চাকরির আশায়। কিন্তু ইউরোপের কোথাও সুবিধা করতে পারেন নি। পারেন নি একটি চাকরি যোগাড় করতে। শেষে হতাশ হয়ে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন ইংল্যান্ড। সে ১৮০৩ সালের কথা।

বেলজনি ছিলেন বিরাট চেহারার লোক। পাক্কা ছয় ফুট সাত ইঞ্চি লম্বা। তাঁর স্ত্রীও তাঁর চাইতে কম ছিলেন না। বেলজনির শরীরেও ছিল বেজায় শক্তি। তাঁকে দেখে ইংল্যান্ডের একটি সার্কাস পার্টির পছন্দ হল। কিন্তু সার্কাস পার্টিতে কি খেলা দেখাবেন তিনি? চিন্তায় পড়লেন। অবশেষে গ্রিক পুরানের মহাবীর হারকিউলিস ও গ্রিক দেবতা এপোলো সেজে শক্তির খেলা দেখাতে লাগলেন। পরে ভ্রমণের জন্য তিনি স্পেন ও পর্তুগাল যান এবং ঐসব জায়গায় স্যামসনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। কিছুদিন মোটামুটি চলল ভালোই। কিন্তু আবার সেই আগের রোগ- অস্থিরতা ফের মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। একঘেয়েমি বলে মনে হল তাঁর পেশাকে। সার্কাসের চাকরিতে আর তাঁর মন বসে না। শেষে একদিন একেবারে তা ছেড়েই দিলেন।

বেলজনির গুণও ছিল। যান্ত্রিক কলাকৌশল সম্বন্ধে তাঁর কিছু জ্ঞানও ছিল। সার্কাসে তিনি পানির খেলা দেখাতেন। পরে ঐ বিদ্যাটির তিনি আরো উন্নতি করেছিলেন। ফলে পানিবিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এত বিদ্যা যার পেটে অথচ কেউ জানবে না! এটা কেমন করে হয়।

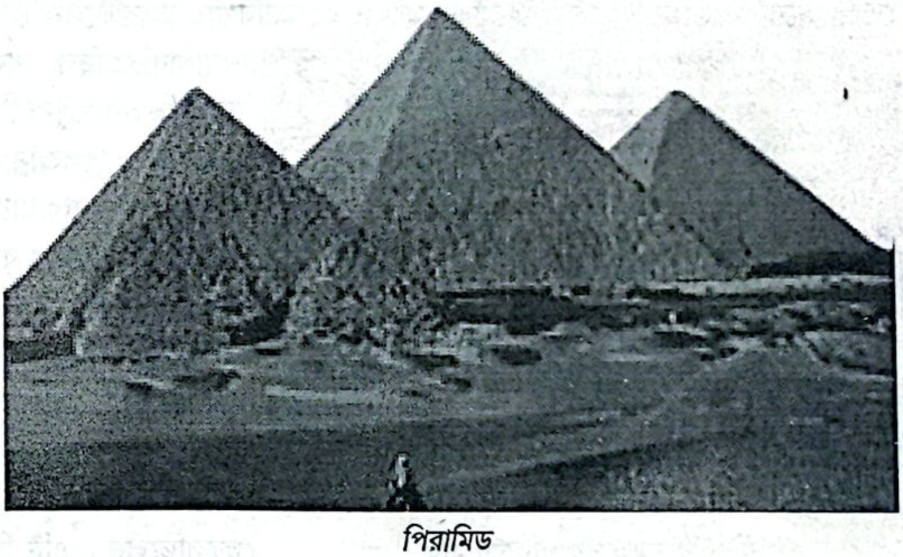

পিরামিড

facebook/@maktabatuttalamij

এসব বিদ্যা জাহির না করা পর্যন্ত তাঁর মনে শান্তি ছিল না। এক সময় সুযোগও এসে গেল। তিনি জানতে পারলেন যে, মিশরের শাসনকর্তা (পাশা) মোহাম্মদ আলী তাঁকে সেখানকার পানি সেচের কাজে লাগাতে পারেন। আশায় বুক বেঁধে তিনি হাজির হলেন গিয়ে মিশরে। পাশাও তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন। চাকরিও দিলেন। নীল নদের তীরে সুব্রা নামক স্থানের কৃষি বাগানে পানি সেচের কাজ। কিন্তু বেলজনির মধ্যে ছিল সস্তায় বাজিমাত করার প্রবণতা। কাজে ফাঁকি দেওয়ারও অভ্যাস ছিল তাঁর। পাশার কানে গেল কথাটা। পাশা বেলজনির সাথে যে সব কাজের চুক্তি করেছিলেন, সব বাতিল করে দিলেন।

প্রাচীন মিশরীয় পাত্র

আবার অনিশ্চিত জীবন। বেলজনি পড়ে গেলেন, আর্থিক টানাপড়েনে। চাকরি নেই, টাকাকড়ি নেই, দিন আর চলে না। কিছু একটা করা একান্তই দরকার। কিন্তু না, কিছুতেই সুবিধা করতে পারছেন না তিনি। মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। নাচ দেখালে কেমন হয়! অগত্যা কায়রো শহরের রাস্তায় রাস্তায় তাঁরা স্বামী-স্ত্রী নাচ দেখিয়ে বেড়াতে লাগলেন। ঐ দশাসই চেহারায় পথে পথে নাচের মহড়া, দর্শকেরও অভাব হয় নি। যা হোক, চিরদিন তো আর রাস্তায় রাস্তায় নাচ দেখিয়ে বেড়ানো যায় না। সাথে অন্য কাজের চেষ্টাও করে যাচ্ছিলেন। আবারো এক সুযোগ এসে গেল।

বেলজনি যে সময় কাজের ধান্দায় মিশরের পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, সেই সময় মিশরে ব্রিটিশ-কনসাল-জেনারেল ছিলেন হেনরি সল্ট। তার সঙ্গে দেখা হল বেলজনির। পরিচয় থেকে ঘনিষ্ঠতা হল। সল্ট তাঁকে পরামর্শ দিলেন: এখানে পথে পথে ঘুরে না বেড়িয়ে তুমি বরং আমার হয়ে কিছু কাজ করতে পারো।

কী কাজ?– বেলজনি উৎসাহিত বোধ করেন।

মিশরে প্রাচীন দামি দামি জিনিসের তো অভাব নেই। সেগুলো সংগ্রহ করে কায়রোয় নিয়ে আসার ব্যবস্থা করো। টাকার অভাব হবে না।

সল্টের প্রস্তাবটা বেলজনির মনে ধরল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেলেন এবং পুরাকীর্তি সংগ্রহকারী হিসেবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিখ্যাত হয়ে উঠলেন।

বেলজনি ও তাঁর স্ত্রী মিশরে ছিলেন প্রায় চার বৎসর। আর তাঁরা ঘুরে বেড়িয়েছেন মিশর ও নুবিয়ার আনাচে কানাচে। এই সময় অর্থাৎ ১৮১৭ সালে তিনি প্রাচীন মিশরের সম্রাট ফারাও প্রথম সেথসের কবর ভেঙে ঢুকে পড়েছিলেন তাঁর কবরের মধ্যে এং আবিষ্কার করেছিলেন সেথসের পাথরের তৈরি শবাধারটি। শবাধারটি ছিল নানা শিল্প কারুকাজে অলঙ্কৃত ও সুশোভিত। পুরাকীর্তি হিসেবে এটি ছিল খুবই মূল্যবান। বেলজনি এ সুযোগ হাতছাড়া করার পাত্র ছিলেন না। শবাধারটি যথাসময়ে তিনি পাচার করে দিলেন ইংল্যান্ডে। বর্তমানে সেটি যত্ন সহকারে রক্ষিত আছে লন্ডনের সোন নামক জাদুঘরে। বেলজনি প্রথম সেথসের কবর আবিষ্কার করেছিলেন বলে আজো গাইড বইয়ে সেটিকে 'বেলজনির সমাধি' রূপে উল্লেখ করা হয়। এরপর তিনি ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে মিশরের গিজা নামক স্থানের দ্বিতীয় বৃহত্তম পিরামিডটি খুলে ফেলেছিলেন। এটি ছিল ফারাও সেফ্রেনের সমাধি।

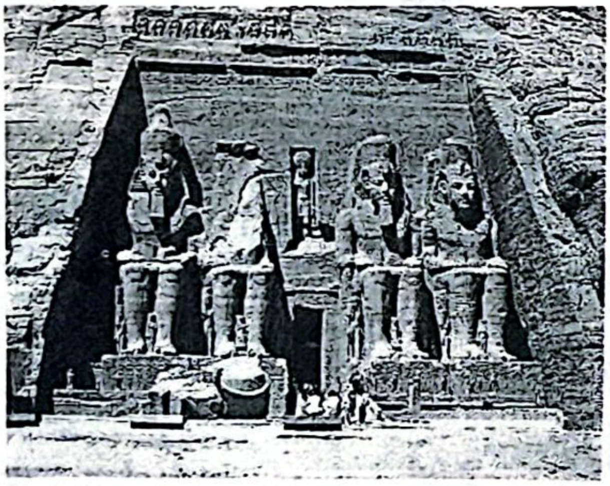

মিশরীয় সম্রাটদের পাথরের মূর্তি

facebook/@maktabatuttalamij

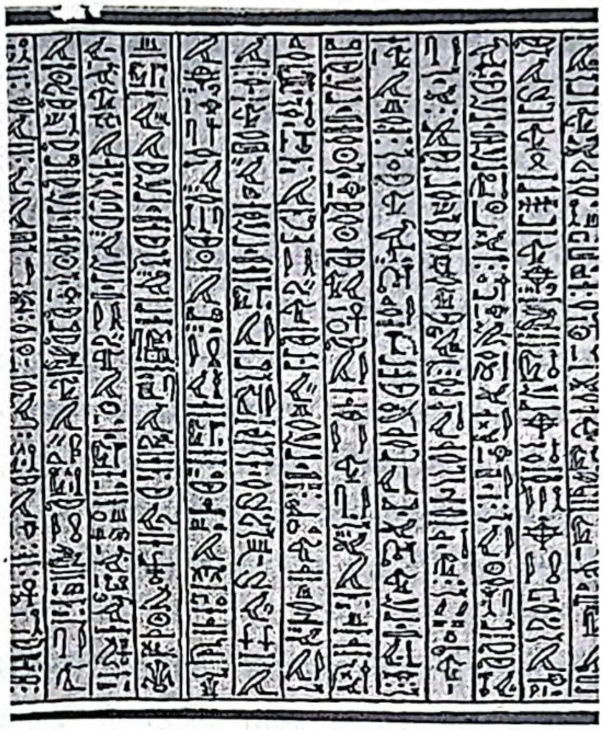

প্যাপিরাসের উপর হাইরোগ্লিফিক লিপি

ব্রিটিশ মিউজিয়াম যখন বেলজনিকে থিবিস থেকে জাহাজযোগে মিশরীয় পুরাকীর্তি লন্ডনে পাঠাবার দায়িত্ব দান করে, তখন তিনি এ দায়িত্ব পালনে মোটেও দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করেন নি। তিনি সঙ্গে সঙ্গে ফারাও রামসেসের বিরাট মূর্তি খুঁড়ে বের করেন এবং সাগর পথে পাঠিয়ে দেন লন্ডনে। বেলজনি রামসেসের কবর থেকে সংগ্রহ করেন প্যাপিরাস, নানা ভাস্কর্যশিল্প এবং আরো অনেক মূল্যবান সামগ্রী– যা তাঁর দৈহিক ও বুদ্ধিবলে লন্ডনে পাঠানো সম্ভব হয়েছিল। নিজের উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য এমন কোনো কাজ ছিল না, যা তিনি করেন নি। আর ঐ সব কাজের জন্য তাঁকে কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তবে এ কথা ঠিক যে, খনন কাজে বেলজনি ঐ যুগের প্রচলিত রীতিই অনুসরণ করেছিলেন। সে সময় দেয়াল ভাঙার জন্য কখনো কখনো বিরাট বিরাট লোহার হাতুড়ি, রড, গাঁইতি ইত্যাদি ব্যবহার করা হত। আর বেলজনিও অন্যদের মতো এসব হাতিয়ার ব্যবহার করতে মোটেও কসুর করেন নি। সেকালে খনন কাজ ও প্রত্নসামগ্রী উদ্ধার কাজের বিবরণ রাখার রেওয়াজ ছিল না। বেলজনিকে ধন্যবাদ যে, তিনি রামসেসের যে মূর্তিটি লন্ডন পাঠিয়েছিলেন, তার ছবি নিজের হাতে এঁকেছিলেন এবং ১৮২০ খ্রিস্টাব্দে তাঁর খননকাজ সম্পর্কে একখানি বইও লিখে গিয়েছেন। ১৮২৩ খ্রিস্টাব্দের বসন্তকালে বেলজনি তাঁর সংগ্রহ করা পুরাকীর্তিগুলোর এক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন ইংল্যান্ডের পিকাডিলির ইজিপ্‌শিয়ান হলে।

এরপর ১৮২৩ সালেরই প্রথম ভাগে বেলজনি নীল নদের উৎস অনুসন্ধানের জন্য তিমবকতু রওয়ানা হন। তাঁর একান্ত ইচ্ছা ছিল, তিনি এটলাস পর্বত ও সাহারা মরুভূমি পার হয়ে তিমবকতু পৌঁছাবেন। কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা পূরণ হয় নি। শেষ পর্যন্ত তিনি সেখানে নদীপথে যাওয়াই স্থির করেন। আর এই যাত্রাই তাঁর জীবনের শেষ যাত্রা। পথে গোয়াতো নামক এক গ্রামের কাছে তিনি মারা যান, ঐ বৎসরেরই ডিসেম্বর মাসের ৩ তারিখে বড় করুণ ও অসহায় অবস্থায়।

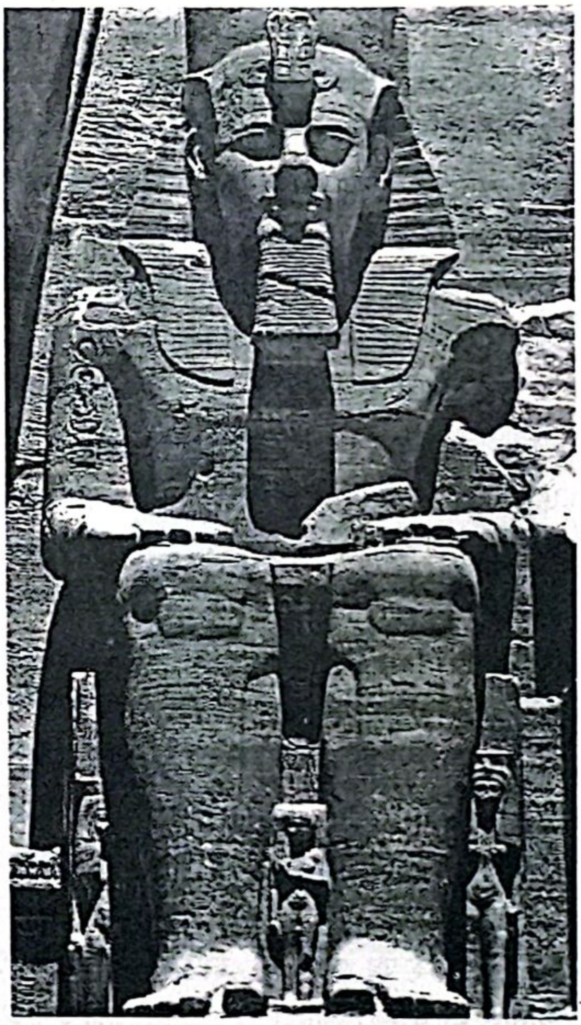

পাথরের তৈরি বিশাল রামসেস মূর্তি

facebook/@maktabatuttalamij

এক ফেরাউন ও তার কবরের কাহিনী

মাথায় হেলমেট পরা একটি ছোট ইউরোপীয় দল তুতানখামেনের কবর খোঁড়ার কাজ তদারকি করছিল। আর একজন আরবি দোভাষী তা চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। ঐ দোভাষীকে অবশ্য নিয়োগ দান করেছিলেন লন্ডনের একটি খবরের কাগজের এক সংবাদদাতা। তোমাদের মনে হয় তো প্রশ্ন জাগতে পারে, কে ছিলেন ঐ তুতানখামেন? আর কী-ই বা ছিল তাঁর কবরের মূল্য?

প্রাচীনকালে একের পর এক রাজবংশ রাজত্ব করে গেছে মিশরে। আর তুতানখামেন ছিলেন আঠারো নম্বর রাজবংশের রাজা– মিশরীয়রা বলতেন ফারাও। ফারাও কথাটি থেকে আমরা পেয়েছি ফেরাউন কথাটি। তুতানখামেন রাজত্ব করে গেছেন আজ থেকে কয়েক হাজার বৎসর আগে– যিশু খ্রিস্টের জন্মেরও প্রায় ১৩৫০ বৎসর পূর্বে। তিনি ছিলেন ফারাও আখনাটনের জামাতা। তাঁর বিয়ে হয়েছিল খুব কম বয়সে। আর মারাও গিয়েছেন মাত্র আঠারো বৎসর বয়সে। অল্প বয়সে মারা গেলে কি হবে, তাঁকে কবর দেয়া হয়েছিল কিন্তু খুব ঘটা করে– মহা ধুমধাম ও জাঁকজমকের সঙ্গে।

ইতোমধ্যে তোমরা জেনেছ যে, ফারাওদের কবরকে বলা হয় পিরামিড। তোমাদের আরো জানা হয়েছে যে, প্রাচীনকালের সাতটি আশ্চর্য জিনিসের মধ্যে পিরামিড অন্যতম। মিশরবাসীরা বিশ্বাস করতেন যে, মৃত্যুর পর মানুষ আবার তার জীবন ফিরে পায়। কবরের জীবনে যাতে মৃতব্যক্তির কষ্ট না হয়, পৃথিবীতে থাকতে তিনি যেসব জিনিস ব্যবহার করতেন, তার প্রায় সবই দেয়া হত পিরামিডের মধ্যে মমির সঙ্গে। আর ওগুলোর মধ্যে থাকত আগেই বলেছি– তাঁর চাকর-বাকর, দাস-দাসী, খাট-পালং, গাড়িজুড়ি, তাগাবাজু, সোনারূপাসহ আরো কত দামি দামি জিনিসপত্র।

তুতানখামেনের মমি রাখার জন্য কফিনই ছিল কয়েকটি– একটির ভেতর আর একটি। একেবারে ভেতরে যে কফিনটি ছিল তার মূল্য অনেক অনেক দিন আগেই সোনার মূল্যে হিসেব হয়েছে প্রায় ৬৪,০০০ পাউন্ড। তোমরা তো জানো, বাংলাদেশে বর্তমানে এক পাউন্ডের মূল্য কম করে হলেও বাংলাদেশি টাকায় ১২০ টাকা। এ হিসেবে বলা যায়, অঢেল সোনা-দানা, টাকা-পয়সা ব্যয় করে দারুণ জাঁকজমকের সঙ্গে অল্প বয়সের তুতানখামেনকে কবর দেয়া হয়েছিল। কিন্তু কেন, কেউই তা জানে না, হয়তো কোনোদিন জানাও যাবে না।

তুতানখামেন

facebook/@maktabatuttalamij

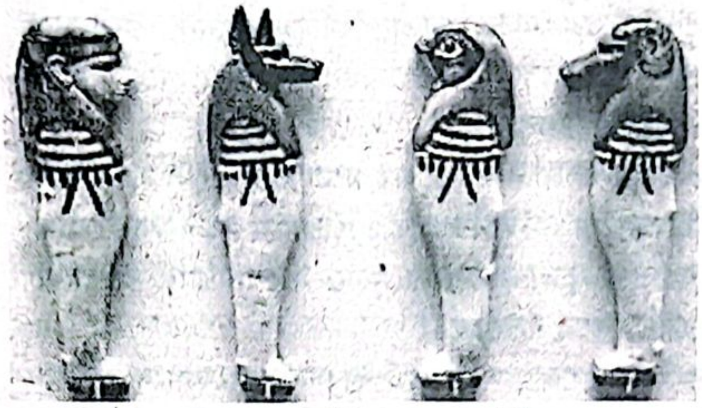

ফারাওদের বিভিন্ন দেবতার মূর্তি

এতক্ষণ দোভাষীর নজর ছিল খনন কাজের দিকে। এবার তিনি চোখ ফেরালেন। মনিবের দিকে চেয়ে তিনি বললেন– খননকারীরা সোনা-দানা ও মৃত্যু দুই-ই পাবে। দোভাষীর এই হঠাৎ কথায় সাংবাদিক ভয়ে শিউরে উঠলেন এবং ঐ সব কথার কারণ কি জানতে চাইলেন।

'কারণ', দোভাষী তাঁকে বললেন, 'বুড়ো দেবতারা সদাজাগ্রত। ঐ লোকটা ছিল'– তুতানখামেনের কবরের দিকে আঙুল উঁচিয়ে বললেন, 'নাস্তিক। সে বুড়ো দেবতাদের চিনতে দেরি করেছিল, আর সব দেবতার বড় দেবতা আমেন রা-কে খুব রাগিয়ে দিয়েছিল। তাই তিনি তাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন।'

ওপরের কথাগুলো লর্ড কারনারভনকে জানানো হয়েছিল। তোমরা হয়তো জানো না, লর্ড কারনারভন ছিলেন ইংল্যান্ডের কারনারভন নামক স্থানের পঞ্চম আর্ল। তাঁর পুরো নাম ছিল জর্জ এডওয়ার্ড স্ট্যানহোপ মলিনিয়াক্স হার্বার্ট। তিনি জন্মেছিলেন ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে। তুতানখামেনের কবর আবিষ্কারের কাজে সহযোগিতা দানের জন্য তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন। কারনারভন ওপরের কথাগুলো শুনেছিলেন এবং গুরুত্ব সহকারে বলেছিলেন, হ্যাঁ, তা হতেই পারে। আর এটাকে একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।

তাদের ধর্মের সব আচার-অনুষ্ঠান পালন করার পর তুতানখামেনকে কবর দেয়া হয়েছিল বটে; কিন্তু যে নৌকোয় তাঁর লাশ কবরস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তার গলুইয়ে স্থাপন করা হয় নি দেবতা রা-এর মূর্তি। তাছাড়া দেবতা টেম, শু, টেফনাট, সেব, মুট, ওরিসিস, আইসিস, সুতি ও নেফথাইস-এর মূর্তিতে রং-ও দেয়া হয় নি। পাইনের তেলও মাখানো হয় নি। আর ঐ সব অনুষ্ঠান পালন করা হয় নি বলে তুতানখামেনের কবরের মধ্যে শান্তির জাদুমন্ত্র প্রবেশ করতে পারে নি। তাই তার কবর জুড়ে বিরাজ করছিল মহা অশান্তি। আর এই অশান্তির মূলে ছিল দেবতা আমেন রা-র অভিশাপ। একথা বিশ্বাস করত প্রাচীন মিশরবাসী।

ওপরে মিশরের মাত্র জন কয়েক দেবতার নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তোমাদের হয়তো জানা নেই, প্রাচীন মিশরবাসীরা বহু দেবতায় বিশ্বাস করত। তাদের সংখ্যাও ছিল প্রায় দুই হাজার দুই শত। কিন্তু তুতানখামেনের শ্বশুর চতুর্থ আমেনহোটেপ হুকুম জারি করেন যে, তাঁর রাজ্যে কেবল এটন দেবতাই থাকবেন এবং প্রজারা একমাত্র তাঁরই পূজা করবে। যেমন আদেশ তেমন কাজ। ব্যস, অন্যসব দেবতার মন্দির বন্ধ হয়ে গেল, মায় আমেন রা-র কর্ণাক মন্দির। দেয়ালে লেখা আর সব দেবতার নাম মুছে ফেলা হল। থিবিস থেকে মিশরের রাজধানী সরিয়ে নেয়া হল নীল নদের ভাটিতে আমার্না নামক স্থানে।

মিশরীয় ভাস্কর্য

এটন দেবতাকে খুশি করার জন্য আমেনহোটেপ নিজের নামই বদলিয়ে ফেলেন। তাঁর নতুন নাম হয় আখনাটন। তিনি মারা গেলে তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে– তিনি তাদের ধর্মের সর্বনাশ করেছেন; তিনি মহা পাপ করেছেন। প্রজারা আখনাটনের বিরুদ্ধে এমন ক্ষ্যাপাই ক্ষেপে যায় যে, তাঁর মমিরও বিস্তর ক্ষতি করে। তুতানখামেন এতে খুব ভয় পেয়ে

facebook/@maktabatuttalamij

মিশরীয় সম্রাটের দেয়াল চিত্র

যান এবং নির্বাসিত দেবতাদের আবার ক্ষমতায় ফিরিয়ে আনেন। দেবতারা কিন্তু এতে খুশি হন নি। বরং উল্টো তাঁদের ভয়ঙ্কর রাগ গিয়ে পড়ে কবরে শায়িত তুতানখামেনের মমির ওপর।

পুরাতত্ত্ববিদেরা ছিলেন বৈজ্ঞানিক। তাঁদের মনে কোনো কুসংস্কার ছিল না। ভূত-প্রেত জাতীয় কোনো জিনিসের প্রতিও তাঁদের কোনোরূপ বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু তবুও তাঁরা তুতানখামেনের কবরে কেমন যেন অশরীরী শক্তির উপস্থিতির প্রভাব অনুভব করতেন।

তুতানখামেনের কবর খোলার সময় লর্ড কারনারভন সেখানে হাজির ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন হাওয়ার্ড কার্টার ও তাঁর সেক্রেটারি ডিক বিথেল। সেখানে আরো উপস্থিত ছিলেন কায়রোর ডিপার্টমেন্ট অব এন্টিকুইটিজের দায়িত্বে নিযুক্ত ফরাসি প্রত্নতত্ত্ববিদ এম. বেনিডাইক ও এম. প্যাসানোভা নামের এক লোক। হাওয়ার্ড কার্টার সম্বন্ধে তোমাদের জানা দরকার যে, তাঁর জীবনের সব চাইতে বড় কীর্তি হচ্ছে ফারাও তুতানখামেনের কবর আবিষ্কার। আর আগেই বলেছি, এ কাজে তিনি যথেষ্ট সহযোগিতা পেয়েছিলেন লর্ড কারনারভনের নিকট থেকে। কার্টার 'তুতানখামেন নামে দুই খণ্ডের একখানি বই লিখে গিয়েছেন। এবং বইখানির ভূমিকায় তিনি লর্ড কারনারভনের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। কার্টার জন্মেছিলেন ১৮৭৩ সালে।

তুতানখামেনের কবর আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯২২ সালের নভেম্বর মাসে এবং খোলা হয় ১৯২৩ সালের ১৬-১৭ ফেব্রুয়ারি। সেই সময় কবরের মধ্যে ঢুকেছিলেন আরো দুইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। এঁদের একজন ছিলেন কারনারভনের সৎ-ভাই কর্নেল মারভিন হার্বাট এবং অন্যজন ছিলেন এইচ.জি. ইভলিন-হোয়াইট। হার্বার্ট যখন কবরে ঢুকছিলেন, তখন তিনি থর থর করে কাঁপছিলেন; চলতে চলতে থমকে দাঁড়াচ্ছিলেন এবং ভেতরে ঢুকবেন কিনা ইতস্তত করছিলেন। বলছিলেন, 'কত ভালো হত, যদি কারনারভন কবরটা আবিষ্কার না করতেন। সামনে আমাদের পরিবারে ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে যাচ্ছে।' তাঁর এ অনুমান ফলতে দেরি হয় নি এবং বৎসর ঘুরতে না ঘুরতেই তিনি মারা যান।

কবরের ঢাকনা খোলা হয়। কারনারভন ভেতরে ঢোকেন। তাঁর মুখে ছিল হাসি। আর্থার উইগাল নামের এক লেখক বলেছেন, 'কারনারভন না হাসলেই ভালো করতেন।' লর্ড কারনারভনের গালে কিসে যেন কামড় দিল এবং তুতানখামেনের কবর পুরোপুরি আবিষ্কৃত হওয়ার আগেই তিনি মারা গেলেন। তুতানখামেনের মূল কফিনটি আবিষ্কৃত হয়েছিল ১৯২৪ সালের ৩ জানুয়ারি আর লর্ড কারনারভন মারা যান মিশরে ৬ এপ্রিল ১৯২৩ সালে। যদিও বলা হয় তিনি মারা গেছেন মশার কামড়ে ও নিউমোনিয়া রোগে, তবু তাঁর মৃত্যুকে ঘিরে রয়েছে এক রহস্যের বেড়াজাল।

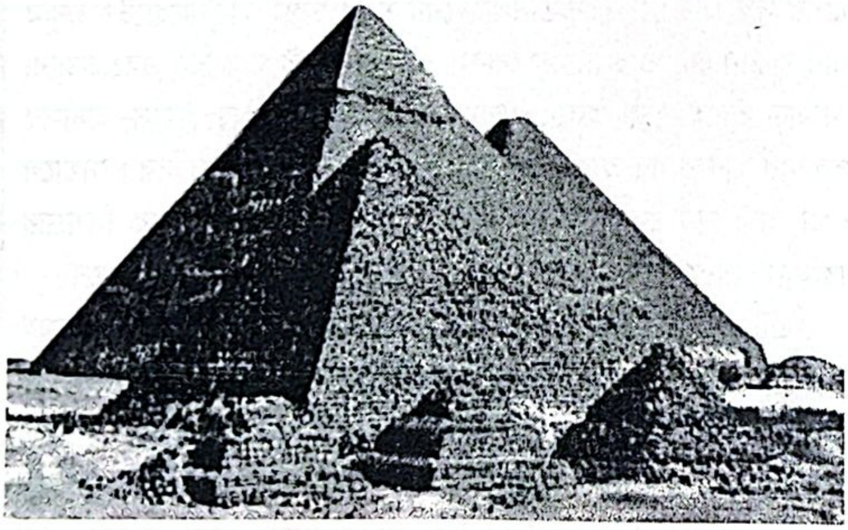

মিশরীয় সম্রাটদের কবর

facebook/@maktabatuttalamij

ইভলিন-হোয়াইট ছিলেন মিশর সম্পর্কে এক বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ। তুতানখামেনের কবর খোলার পর তিনি যেন কেমন বদলে গিয়েছিলেন। তাঁর মনে হচ্ছিল কোনো অদৃশ্য ভয়ঙ্কর কিছু তাঁকে সব সময় তাড়া করে ফিরছে। শেষে তাঁর এমন অবস্থা হল যে, এক বৎসরের মধ্যে আত্মহত্যা করে তিনি রেহাই পেয়েছিলেন। স্যার আর্চিবল্ড ডগলাস রিড ছিলেন এক জাঁদরেল রেডিওলজিস্ট। মমি এক্স-রে করার জন্য তাঁকে মিশরে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু এক বৎসরের মধ্যে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের এক মার্কিন বিজ্ঞানীর নাম ছিল অধ্যাপক ল্যাফলিউর। কবর পরীক্ষা করার জন্য তিনি মিশরে আসেন। কিন্তু লুক্সর থেকে জীবিত ফিরে যেতে পারেন নি। লুক্সর হচ্ছে মিশরের সেই জায়গা, যেখানে বহু রাজার কবরের সাথে ছিল তুতানখামেনের কবরটিও। এ এলাকাকে 'রাজার উপত্যকা'ও বলা হয়।

মিশরীয় দেবতার মূর্তি

সাতজন ফরাসি লেখক ও সাংবাদিক তুতানখামেনের কবরটি দেখতে গিয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ছ'জনই দু'বৎসরের মধ্যে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁরা যখন তুতানখামেনের মুখের আবরণ সরিয়েছিলেন, তখর তাঁরা তাঁর মুখে একটি দাগ দেখতে পেয়েছিলেন– যেমন দাগ তাঁরা দেখেছিলেন লর্ড কারনারভনের মুখের ঐ একই জায়গায়।

হাওয়ার্ড কার্টারের একটি প্রিয় পোষা ক্যানারি পাখি ছিল। তিনি যেখানেই যেতেন, সেখানেই পাখিটিকে সাথে করে নিয়ে যেতেন। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, তুতানখামেনের কবরটি যেদিন খোলা হয়, সেদিনই একটা গোখরো সাপ কার্টারের বাড়ি যায় এবং ক্যানারি পাখিটিকে কামড়িয়ে মেরে ফেলে। অথচ গোখরো সাপ মিশরে খুব কমই দেখা যায়।

আর এক লোক। নাম তাঁর উলফ জোয়েল। তুতানখামেনের কবরটি দেখার জন্য গিয়েছিলেন এবং এক বছরের মধ্যে মারা যান। জে গোল্ড নামের আর এক লোক কবরের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মারা যান।

কম বয়সী, মধ্য বয়সী, বেশি বয়সী– যিনিই তুতানখামেনের কবর দেখতে গিয়েছেন তিনিই দুর্ভাগ্যের শিকার হয়েছেন। মারা গেছেন রহস্যজনক ও করুণভাবে। এর যে ব্যতিক্রম নেই, তা অবশ্যি নয়। হাওয়ার্ড কার্টারের কথাই ধরা যাক। তিনি নিজেই বেঁচে ছিলেন কবর খোলারও অনেকদিন পর এবং মারা যান ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে। তবে প্রায় প্রতিটি কর্মী যিনিই কবরের ভেতর ঢুকেছেন, তিনিই মারা গেছেন। কায়রো জাদুঘরে যে সব প্রত্নসামগ্রী সংরক্ষতি আছে, সেগুলোর জাদুগুণ আছে বলে মনে করা হয়। তাই ঐ সব জিনিস দেখাশোনার দায়িত্বে যাঁরা থাকেন, তাঁরা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং মারা যান। কারণ কিন্তু জানা যায় না। মিশরীয় পুরাতত্ত্বের আধুনিক পণ্ডিতেরা তাঁদের লেখায় ঐ সব মৃত্যু রহস্যের সকল কথায় সমর্থন করেন না– আবার ব্যাখ্যাও দিতে পারেন না। তবে এটা ঠিক যে, ১৯২২ সাল থেকে তুতানখামেনের কবর খোলার সঙ্গে জড়িত বারো জন লোক সাত বৎসরের মধ্যে মারা গিয়েছেন। আর ঐ সব মৃত্যুর জন্য আমেন রা-র অভিশাপকে দায়ী বলে বিশ্বাস করা হয়।

facebook/@maktabatuttalamij

হারিয়ে গেল আজটেক জাতি

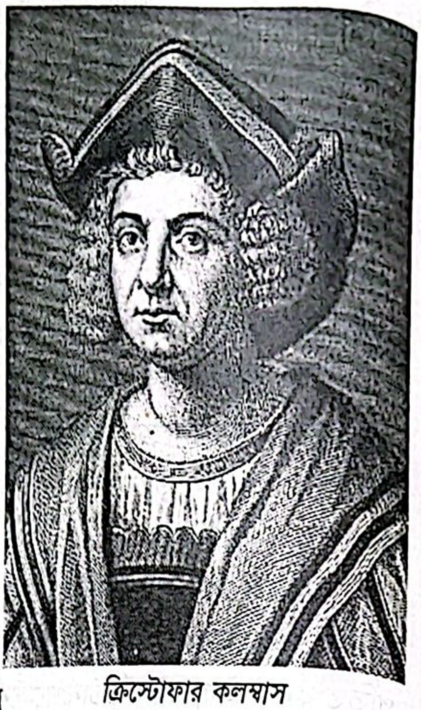

ক্রিস্টোফার কলম্বাস

১৪৯২ সাল। আজ থেকে পুরো পাঁচ শ' বছরেরও আগের কথা। বিখ্যাত ক্রিস্টোফার কলম্বাস আবিষ্কার করেছিলেন আমেরিকা। তাঁর আগে আমেরিকা ও এর বাসিন্দাদের সম্বন্ধে কেউই বিশেষ কিছু জানত না। এরপর কয়েকজন দুঃসাহসী লোক গিয়েছিলেন দক্ষিণ আমেরিকা। ওঁরা নিছক আবিষ্কারের নেশায় কিন্তু ওখানে যান নি, বৈজ্ঞানিক অনুরাগ বা শিল্পকলার প্রতি আগ্রহও ওঁদের ছিল না। ওঁদের আসল উদ্দেশ্য ছিল ওখান থেকে মূল্যবান ধনসম্পদ লুট করে নিজেদের দেশে নিয়ে আসা। ওঁরা গিয়েছিলেন মধ্য আমেরিকার মেক্সিকোতে; পাড়ি জমিয়েছিলেন দক্ষিণ আমেরিকার পেরু অঞ্চলে। আর এসব জায়গা থেকে তাঁরা নিয়ে এসেছিলেন কাঁড়ি কাঁড়ি সব অমূল্য ধনরত্ন। ঐ সব কাজ করতে গিয়ে তাঁরা অকথ্য অত্যাচার করেছেন, লুট করেছেন এবং নির্মমভাবে হত্যা করেছেন ঐ সব এলাকার হাজার হাজার মানুষকে। ধনরত্ন ইত্যাদি ডাকাতি করতে গিয়ে এমন কোনো কাজ ছিল না, যা তাঁরা করেন নি।

যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় মেক্সিকো দেশে বাস করত আজটেক নামে এক জাতির লোক। তাঁরা যুদ্ধ করতেন বটে, তবে সে যুদ্ধ দেশ জয় করার জন্যও ছিল না, ক্ষমতা বাড়াবার জন্যও ছিল না। তাঁদের যুদ্ধ করার মূল উদ্দেশ্য ছিল শত্রুপক্ষের লোকেদের বন্দি করা। তাঁরা ছিলেন ইন্ডিয়ান। অন্যান্য ইন্ডিয়ান জাতির মতো তাঁদেরও ছিলেন একজন প্রধান দেবতা। তাঁর নাম ছিল কোয়েটজল কোয়াটল। তিনি ছিলেন সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের দেবতা। ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী তাঁদের দেবতার মন্দিরে জ্যান্ত মানুষ বলি দিতে হত। আর এ কাজে ব্যবহৃত হত বন্দি লোকজন। বলির আগে বন্দিদের নাচতে হত, গাইতে হত। তারপর তাদের নিয়ে গিয়ে বলি দেয়া হত মন্দিরের দোরগোড়ায়। তাঁরা জ্যান্ত মানুষের বুক চিরে টেনে বের করতেন টাটকা কলজে। নিঃসাড় রক্তাক্ত দেহটা এরপর ছুড়ে ফেলে দিতেন সিঁড়ির নিচে। এটা ছিল আজটেকদের একটা নিষ্ঠুর ধর্মীয় প্রথা। স্পেনিশ খ্রিস্টানেরা এ প্রথা পছন্দ করতে পারেন নি। ফলে তাঁরা আজটেক মন্দির অপবিত্র করার এবং সেখানকার মূল্যবান ধনরত্ন লুণ্ঠন করে নিজেদের দেশ স্পেনে পাচার করার চমৎকার অজুহাত খাড়া করেছিলেন। হারনান্ডো কর্টিস বলির জায়গা বন্ধ করে দিয়েছিলেন এবং খ্রিস্টান পুরোহিতদের নির্দেশে আজটেকদের মন্দিরের ওপর তাঁদের ধর্মীয় ক্রশ স্থাপন করেছিলেন। তারপর নির্বিবাদে চলেছিল হত্যা ও লুণ্ঠন কাজ। কর্টিস লুটের মাল ভেট পাঠিয়েছিলেন তাঁর দেশে রাজার কাছে। মেক্সিকোর অধিবাসীদের বাধ্য করেছিলেন খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করতে।

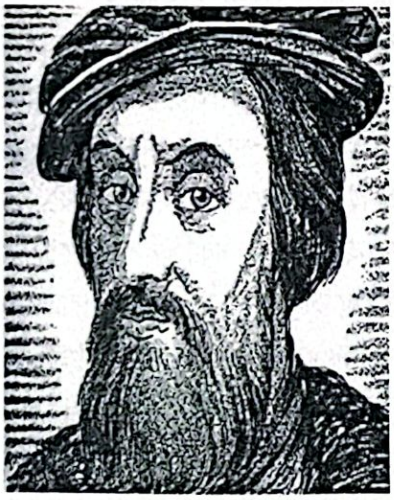

হারনান্ডো কর্টিস

facebook/@maktabatuttalamij

হারনান্ডো কর্টিস জন্মেছিলেন স্পেন দেশের মেডলিন নামক স্থানে ১৪৮৫ খ্রিস্টাব্দে। ছেলে লেখাপড়া শিখে আইনজীবি হবে, বাপ-মায়ের ছিল খুবই আশা। কিন্তু ইউরোপের আবিষ্কার করা নতুন নতুন দেশগুলোর গল্পকাহিনী শুনে শুনে তাঁর কল্পনা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। মাত্র ১৯ বৎসর বয়সে তিনি ওয়েস্ট ইন্ডিজের সান্তা ডোমিংগো নামক স্থানে যাওয়ার সুযোগ পান এবং ১৫১১ সাল পর্যন্ত প্রায় সাত বৎসর তিনি সেখানে থেকে যান। তখন সেখানকার গভর্নর ছিলেন দিয়েগো ভেলাজকিজ। তিনি কিউবা জয় করার জন্য একটি অভিযান পাঠান। কর্টিস ঐ অভিযানে যোগ দেন এবং সে অভিযান সফলও হয়। এরপর ভেলাজকিজ মেক্সিকোর উপকূল আবিষ্কার করার দায়িত্ব দেন কর্টিসকে। তিনি ১৫১৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মেক্সিকোর উদ্দেশে রওয়ানা দেন। সাথে নেন ১১ খানি জাহাজ, ৫০৮ জন সৈন্য, ১০০ জন নাবিক, ১৬টি ঘোড়া, ১০টি বন্দুক, ৪টি হালকা কামান ও ১৩টি শর্টগান। কর্টিস একদিন তাবাসকো নামক স্থানে অবতরণ করেন এবং স্থাপন করেন ভেরাক্রুজ নামক একটি শহর।

রাজা মন্টেজুমা

কর্টিস মেক্সিকো পৌঁছেছিলেন ১৫১৯ সালের শেষ দিকে। ঐ সময় মেক্সিকোর রাজা ছিলেন মন্টেজুমা। রাজা হিসেবে তিনি ছিলেন খুবই ভালো। প্রজারা তাঁকে ভক্তি করত দেবতার মতো। তিনি থাকলেনও মহা শান-শওকতের সঙ্গে। কর্টিসকে তিনি ভেবেছিলেন তাঁদের দেবতা কোয়েটজল কোয়াটল বুঝিবা মানুষের রূপ ধরে নেমে এসেছেন পৃথিবীর মাটিতে। মন্টেজুমা কর্টিসকে সাদর অভ্যর্থনা জানান। তাঁর জাহাজে পাঠিয়ে দেন রকমারি মূল্যবান উপহার। উপহারের বহর দেখে স্পেনিশ লোকজন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিল। কর্টিস ও তাঁর লোকেরা আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল গরুর গাড়ির চাকার মতো ইয়া বিরাট বিরাট সব গোল গোল সোনা-রূপার টাকা দেখে। আজটেকেরা কিন্তু বেশি কদর করত পাখির পালকের তৈরি নকশাদার সব জিনিসপত্রের।

আজটেক দেবতা কোয়েটজল

মন্টেজুমা ১৫১৯ সালে কর্টিসের নিকট যে সব উপহার পাঠিয়েছিলেন, সেগুলোর মধ্যে ছিল পালকের তৈরি একটি মুকুট। মুকুটটি চওড়ায় ছিল ৫ ফুট ৯ ইঞ্চি। মুকুট তৈরির জন্য পাখির লম্বা পালক ব্যবহৃত হত। উত্তমরূপে নির্বাচিত ৫০০টি সেরা পালক দিয়ে অতি যত্ন সহকারে তৈরি হত এক একটি মুকুট। বুঝতেই পারছ, আজটেকদের নিকট ঐ মুকুটের কত মূল্য ছিল!

মধ্য আমেরিকায় প্রত্ন বিষয়ে অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয়েছিল যুদ্ধ দিয়ে এবং শেষও হয়েছিল যুদ্ধ দিয়েই। তোমরা জানো, ফরাসি দেশে এক সময় সম্রাট ছিলেন নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। তিনি মিশর আক্রমণ করেছিলেন ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে। ৩৮,০০০

facebook/@maktabatuttalamij

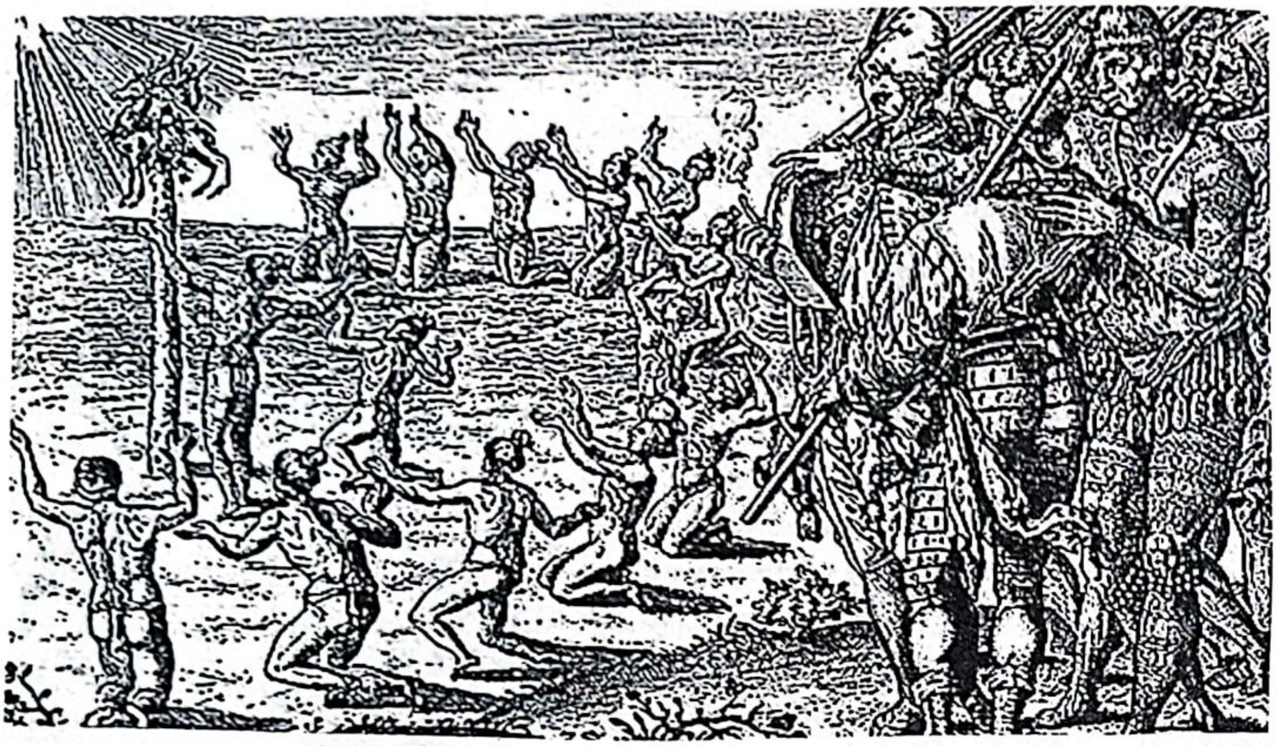

কর্টিসকে দেখে আজটেকেরা ভেবেছিল তাদের দেবতা মানুষ রূপে এসেছে

সৈন্যের এক বিশাল বহর ছাড়াও এ অভিযানে তাঁর সঙ্গে ছিলেন ১৭৫ জনের একটি পণ্ডিত দল। ফলে মিশরে প্রাপ্ত কোনো মূল্যবান প্রত্নসামগ্রীর তেমন একটা ক্ষতি হয় নি। বরং তাঁরা ইউরোপে নিয়ে এসেছিলেন মিশরীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিপুল ভাণ্ডার। কিন্তু কর্টিসের সঙ্গে কোনো পণ্ডিত ছিলেন না। কেবল ছিল সশস্ত্র লোকজন। বলা যায় লাঠিয়ালবাহিনী। তারা নিষ্ঠুরভাবে আজটেকদের পরাজিত করেছিল এবং ধ্বংস করেছিল তাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও প্রত্নসম্পদ। মূল্যবান ধনরত্ন লুণ্ঠন করে পাচার করেছিল নিজেদের দেশে।

আজটেকেরা কিন্তু সহজে স্পেনিশদের কাছে হার মানে নি। তারা স্পেনিশদের ঘাঁটি ভেরাক্রুজ আক্রমণ করেছিল। তাদের উৎখাত করার জন্য কর্টিসও তাঁর লোক-লস্কর নিয়ে হাজির হন রাজপুরীতে। বন্দি করেন আজটেকরাজ মন্টেজুমাকে। ভেরাক্রুজ আক্রমণকারীদের নেতাকে খুঁজে বের করেন এবং খুঁটির সাথে বেঁধে পুড়িয়ে মারেন।

কর্টিসের দোভাষী হিসেবে কাজ করত একটি মেয়ে। মেয়েটির নাম ছিল মালিঞ্চে। পরে সে নিজের ধর্ম ছেড়ে দিয়ে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করে এবং তার নাম হয় মেরিনা। কর্টিস ১৫১৯ সালের ৮ নভেম্বর মন্টেজুমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাতের জন্য যান তাঁর 'ভাসমান' রাজধানী টিনোকটিটলানে। ইতালির ভেনিস শহরের নাম হয়তো তোমরা শুনেছ। ভেনিস শহরের মতোই টিনোকটিটলানও ছিল পানির শহর। যাতায়াত করতে হত নৌকায় চড়ে। কর্টিসও নৌকায় চড়ে দেখা করতে গিয়েছিলেন রাজা মন্টেজুমার সঙ্গে। তাঁর সঙ্গে ছিল মেরিনা। মেরিনা ছিল ক্রীতদাসী; কিন্তু সে ছিল খুবই সুন্দরী। তার নিজের মা ছিল না। ছিল সৎ-মা। সৎ-মা তার সঙ্গে খুব খারাপ আচরণ করত। এ জন্য সে ছিল বড়ই দুঃখী। শার্ল পেরোর নামের সঙ্গে তোমাদের হয়তো পরিচয় নেই। কিন্তু তাঁর রূপকথার সাথে নিশ্চয়ই পরিচয় আছে। তিনি ছিলেন ফরাসি দেশের লোক। কয়েকটি দারুণ মজার মজার রূপকথা লিখে গেছেন তিনি। তাঁর এমনি একটি রূপকথার নায়িকার নাম সিনডেরেলা। আমাদের দেশে গল্পটি 'ঘুঁটেকুড়ুনি' নামে বেশি পরিচিত। 'ঘুঁটেকুড়ুনি'রও আপন মা ছিল না। তার সৎ-মাও তাকে খুব জ্বালাত। তাই সে-ও ছিল বড় দুঃখী। ঠিক মেরিনার মতো। মেরিনার বাবা ছিলেন ধনী লোক। কিন্তু তিনি

facebook/@maktabatuttalamij

একদিন মেয়েকে একা রেখে চলে গেলেন পরপারে। মেরিনার কপালে নেমে এল দুর্ভোগ। সৎ-মা মেরিনাকে বিক্রি করে দিলেন। মেক্সিকোতে আরো একটি জাতি ছিল। সে জাতির নাম ছিল মায়া জাতি। মেরিনা বিক্রি হয়ে চলে গেল মায়াদেরই একজন বড় লোকের কাছে। মেরিনার সৎ-মা তার সব সম্পত্তি দখল করে নিল। মেরিনার মাতৃভাষা ছিল আজটেক ভাষা। মায়া ভাষাও সে চটপট শিখে নিল। এতে তার সুবিধাও হল। স্পেনের লোকেরা যখন মেক্সিকো পৌঁছাল, তখন তাদের দোভাষী ছিল সেনর এগুইলার নামের এক লোক। তার জানা ছিল শুধু মায়া ভাষা। তাই ডাক পড়ল মেরিনার। মেরিনা আজটেক ভাষাকে মায়া ভাষায় তরজমার মতো করে বলতে পারত। সে দেখতে যেমন সুন্দরী ছিল, তেমনি ছিল বুদ্ধিমতী। দ্রুত তার উন্নতি হতে লাগল। প্রথমে হল কর্টিসের সেক্রেটারি; পরে হল তাঁর স্ত্রী।

হারনান্ডো কর্টিস ধনসম্পদের লোভে মেক্সিকোতে এক সাগর রক্ত বইয়ে দিয়েছিলেন। আর সেই রক্তে ভেসে গিয়েছিল আজটেক জাতির উন্নত সভ্যতা। তখন স্পেনের রাজা ছিলেন পঞ্চম চার্লস। কর্টিসের অত্যাচারের কাহিনী তাঁর কানে পৌঁছাল। কর্টিস ১৫২৮ সালে দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হন। তাঁর বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ উঠল। কিন্তু রাজাকে তিনি হাত করে ফেলেন। রাজার কাছে তিনি শুধু ক্ষমাই পান না, কর্টিসকে দেয়া হয় বিপুল সম্মান এবং রাজার সঙ্গে আবার মেক্সিকো যাওয়ার সুযোগ।

এরপর কর্টিস আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠেন। রাজা এবার ভয় পান। কতকটা হিংসাও করতে থাকেন। না, কর্টিসকে আর দেশের বাইরে রাখা নিরাপদ নয়। কর্টিসকে তিনি দেশে ফিরে আসতে হুকুম দিলেন। রাজার হুকুম। অগত্যা দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হন হারনান্ডো কর্টিস।

রাজার জন্য কর্টিস অনেক করেছিলেন। কিন্তু তাঁর শেষের দিনগুলো সুখের হয় নি। তিনি ভগ্নহৃদয়ে মারা যান ১৫৪৭ খ্রিস্টাব্দে। কর্টিসের দক্ষিণ আমেরিকা অভিযানে অন্তত একটা ভালো কাজ হয়েছিল। আর তা হল, ওখানকার লুটের মালের সঙ্গে ইউরোপে এসেছিল আজটেক ও মায়া সভ্যতার ইতিহাস– যা এতদিন ইউরোপীয়দের কাছে ছিল একেবারে অজানা।

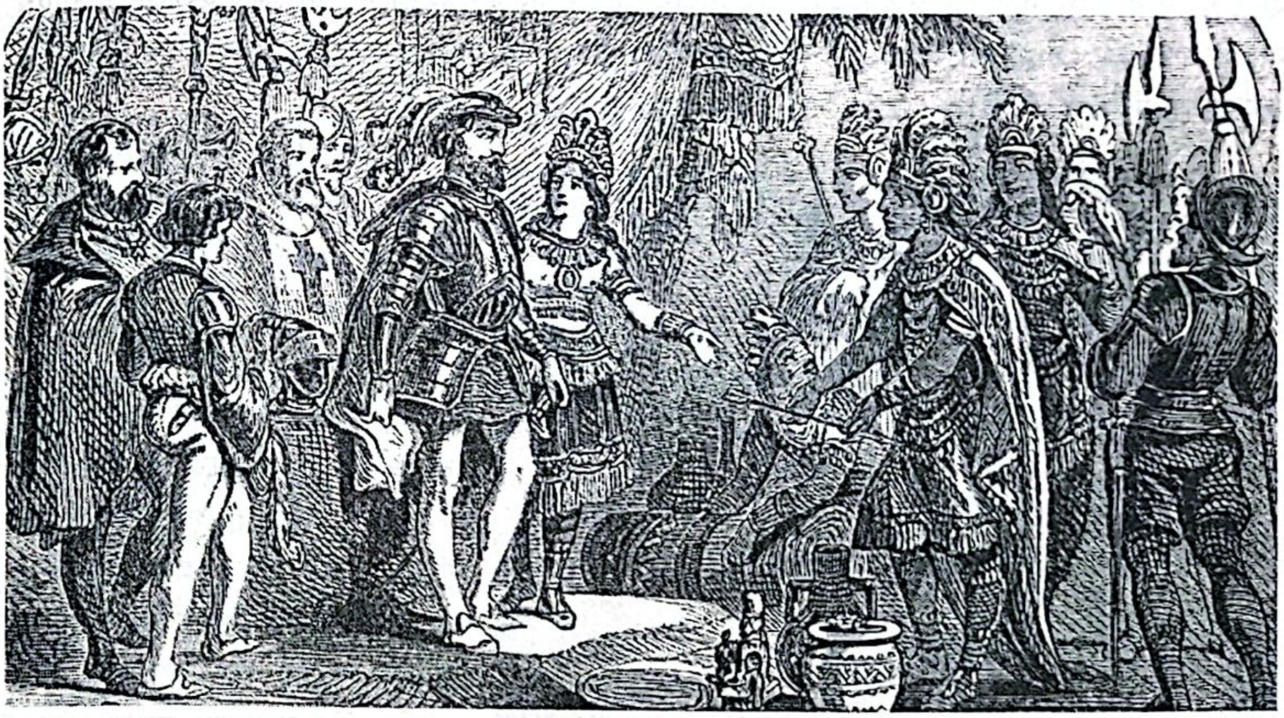

হারনান্ডো কর্টিসের মন্টেজুমার সাথে সাক্ষাৎ

facebook/@maktabatuttalamij

রাখাল থেকে ক্যাপ্টেন জেনারেল

ইতালি দেশের জেনোয়া শহরের বিখ্যাত নাবিক ক্রিস্টোফার কলম্বাসের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। তিনি এক সময় নতুন দেশ আবিষ্কারের আশায় পর্তুগালের রাজধানী লিসবন যান। আর ঐ সময়ই স্পেনের এস্টেমাডুরা প্রদেশের ট্রুজিলো নামক শহরে একটি ছেলের জন্ম হয়। ছেলেটির বাবা ছিলেন সেনাবাহিনীর অফিসার। কিন্তু ছেলেটির মা করতেন ঝিয়ের কাজ। ছেলেটি জন্মালেন বটে; কিন্তু পিতা তাকে ছেলে বলে স্বীকার করলেন না। মায়ের আদর-যত্ন কি জিনিস, তাও তার কপালে জুটল না। অনাদরে অবহেলায় ছেলেটি বড় হতে লাগল। এমন অবস্থায় তার পক্ষে লেখাপড়া শেখাও সম্ভব হয় নি। আর লেখাপড়া না জানলে ভালো কাজই বা তিনি পাবেন কী করে? পেটের দায় বড় দায়। উপায়হীন ছেলেটিকে শেষ পর্যন্ত শূকর চরানোর কাজ নিতে হল। কলম্বাস যখন আমেরিকার উপকূলের দ্বীপগুলো থেকে সফর শেষে ফিরে এলেন, তখন ছেলেটি বড় হয়েছে।

ফ্রান্সিসকো পিজারো

কলম্বাসের এই সমুদ্র সফর কিন্তু অত সহজে সম্ভব হয় নি। টাকা-পয়সা, লোক-লস্কর দিয়ে সাহায্য করার মতো লোক পেতে তাঁকে অপেক্ষা করতে হয়েছিল দীর্ঘ কুড়িটি বৎসর। কিন্তু সফর থেকে কলম্বাসের ফেরার পর অবস্থার পরিবর্তন হল। তখন পশ্চিমে যাওয়ার জন্য প্রায় প্রতিটি ভালো মওসুমে জাহাজ ছাড়তে লাগল। এমনি একদিন জাহাজে চড়ে ছেলেটি সমুদ্রে পাড়ি জমালেন। শূকর পালের রাখাল ছেলেটি ভাগ্যের হাতে নিজেকে সঁপে দিয়ে উপস্থিত হলেন গিয়ে দক্ষিণ আমেরিকার উপকূলভাগে। এতক্ষণে হয়তো ছেলেটির নাম জানার জন্য তোমাদের আগ্রহ হচ্ছে। তাহলে জেনে নাও, এই মায়ে খেদানো বাপে তাড়ানো ছেলেটির নাম ছিল ফ্রান্সিসকো পিজারো। কেউ কেউ তাঁকে পিথারো বলেও ডেকে থাকেন।

দক্ষিণ আমেরিকার কাছে পানামা যোজক। যোজক মানে জানো তো? যোগ করা, অর্থাৎ যে ছোট ভূখণ্ড বড় দু'টি ভূখণ্ডকে যুক্ত করে, তারই নাম যোজক। পানামা যোজক দক্ষিণে যোগ করেছে দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশকে এবং উত্তরে যুক্ত করেছে কোস্টারিকা, নিকারাগুয়া, হন্ডুরাস, গুয়াতেমালা ও মেক্সিকো হয়ে উত্তর আমেরিকাকে। পানামা যোজকের ঠিক দক্ষিণে আছে ড্যারিয়েন নামের এক কলোনি। এই কলোনি প্রতিষ্ঠার কাজে স্পেন থেকে

facebook/@maktabatuttalamij

কলম্বাসের সমুদ্রযাত্রা

পাঠানো হয়েছিল একটি অভিযান। এই অভিযানের রিপোর্ট থেকে প্রথম পাওয়া যায় পিজারোর নাম। সে সময় তাঁর বয়স ছিল প্রায় সাঁইত্রিশ। অভিযানটি দুর্ঘটনায় পড়ে এবং নাবিকদের প্রায় সকলেই মারা যায়। ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান পিজারোসহ মাত্র জনকয়েক যাত্রী। ভাসকো নুনেজ দ্য বালবোয়া নতুন নেতারূপে অভিযানের দায়িত্ব নেন। বালবোয়ার সঙ্গে কাজ করেন পিজারো। ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দে পেড্রো আরিয়াস দ্য আভিলা নতুন কলোনির গভর্নর হয়ে আসেন। পিজারো মনিব বদল করেন। পিজারো ১৫১৯ সালে গভর্নরের পক্ষে বালবোয়াকে বন্দি করেন। বালবোয়ার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অভিযোগ এনে তাঁকে হত্যা করা হয়।

পিজারোর বয়স তখন তিপ্পান্ন বৎসর। এ সময় পানামার কাছে সামান্য কিছু জমিতে একদল ইন্ডিয়ান ক্রীতদাস নিয়ে চাষবাসে ব্যস্ত ছিলেন তিনি। এখানে দিয়েগো দ্য আলম্যাগ্রো নামে তাঁর এক পড়শি ছিলেন। হারনান্ডো দ্য লুকু ছিলেন তাঁর আর এক প্রতিবেশী। এঁরা তিনজনে মিলে খামারের কাজ করতে লাগলেন। এ কাজে ওঁরা দ্রুত খুব উন্নতি করলেন এবং শিগগিরই দু-দু'খানি জাহাজ তৈরি করে ফেললেন। তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল সোনার দেশ নামে কথিত 'আল-ডোরাডো' আবিষ্কার করা। এ কাজের নেতা হলেন পিজারো।

নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি পিজারো নতুন অভিযানে বেরিয়ে পড়েন। খারাপ আবহাওয়া ও উল্টো বাতাস উপেক্ষা করে তাঁর জাহাজ কোনোমতে এগিয়ে চলছিল। ইতোমধ্যে অসুখ-বিসুখ ও শত্রুর আক্রমণে মারা গেল প্রায় বিশজন নাবিক।

পথে দেখা হয় আলম্যাগ্রোর সঙ্গে। তিনি পিজারোকে ছাড়িয়ে আরো দূরে গিয়েছিলেন। ওঁদের বিশ্বাস ছিল, ওঁদের অভিযান সফল হবে। কিন্তু অভিযানে বাধ সাধলেন গভর্নর আরিয়াস দ্য আভিলা। তিনি আর অভিযানের ঝুঁকি নিতে রাজি ছিলেন না। যে ক'জন নাবিক তখনো জীবিত ছিলেন, তিনি তাঁদের হারাতে চান নি। পিজারো কিন্তু দমবার পাত্র ছিলেন না। তিনি এগিয়ে চলেন এবং চলার পথে একটি নৌকার সাক্ষাৎ পান। নৌকার যাত্রীরা তাঁকে জানান যে, তাঁরা ইনকা রাজ্যের টুমবিস বন্দর থেকে আসছেন। তাঁদের রাজার নাম হুয়ায়না কাপাক। তিনি এক মস্ত রাজা। তাঁর রাজধানীর নাম কুজকো।

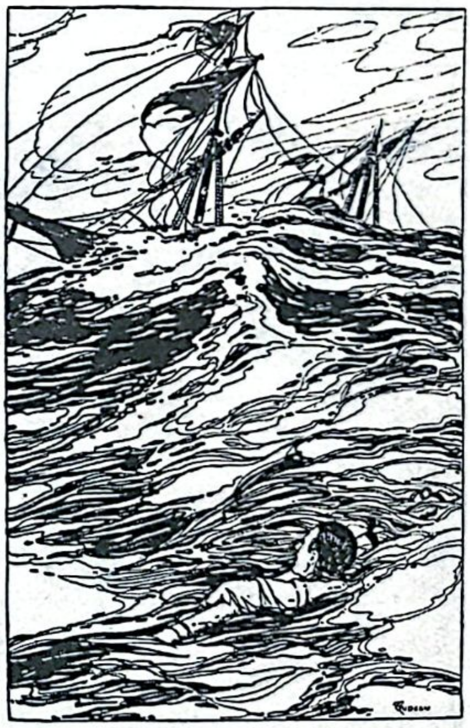

পিজারোর নৌকাডুবি

পিজারোর শারীরিক অবস্থা খুব একটা ভালো যাচ্ছিল না। তবু তিনি দেশটার ভেতরে ঢুকতে চাচ্ছিলেন। নদী পার হতে গিয়ে তাঁর চৌদ্দজন সাথি পানিতে ডুবে মারা গেল। এমন সময় আলম্যাগ্রো নতুন রসদ ও আশিজন লোক নিয়ে হাজির হলেন। এতে পিজারোর সাহস বেড়ে গেল। তিনি নতুন জায়গার সন্ধানে বেরিয়ে পড়েন এবং

facebook/@maktabatuttalamij

টানা কুড়ি দিন চলার পর টুমবিস বন্দরে গিয়ে উপস্থিত হন।

ইনকা রাজা আটাহুয়ালপা

ইতোমধ্যে নতুন গভর্নর হয়ে আসেন পেড্রো দ্য রিয়াস। নতুন জায়গা আবিষ্কারে তাঁর তেমন আগ্রহ ছিল না। অগত্যা পিজারোকে নিজের উদ্যোগে অভিযানে বেরুতে হয়। কিন্তু শিগগিরই তাঁকে ঋণের দায়ে জেলে যেতে হয়। এতে তাঁর খুবই বদনাম হয়। সে বদনামের কথা দেশে রাজার কানে পৌঁছাতেও দেরি হয় না। তিনি তাড়াতাড়ি রাজার সামনে গিয়ে উপস্থিত হন এবং নিজের কাজের জন্য রাজার নিকট জবাবদিহি করেন। রাজাকে সামলাতে তাঁর খুব একটা বেগ পেতে হয় নি। রাজা খুশি হয়ে তাঁকে পেরুর ক্যাপ্টেন জেনারেল ও গভর্নর নিযুক্ত করেন।

১৫৩০ সালের ২৮ ডিসেম্বর। ১৮০ জন লোক ও ২৭টি ঘোড়া নিয়ে পিজারো পানামা থেকে রওয়ানা দেন। তের দিন চলার পর ১৫৩১ সালের জানুয়ারি মাসে এই বাহিনী তীরে নামে। নদীপথে তাদের পেছন পেছন আসে জাহাজ। শুরু হল তাদের প্রভুত্ব স্থাপনের লড়াই। তখন পেরুতে রাজত্ব করতেন ইনকারাজ আটাহুয়ালপা। আটাহুয়ালপার সঙ্গে স্পেনিশদের যুদ্ধ হল। মাত্র আধ ঘণ্টা। দুই হাজারের বেশি ইনকা নিহত হল। স্পেনিশদের মধ্যে একজন মাত্র আহত হলেন। আর তিনি হলেন স্বয়ং পিজারো। রাজা আটাহুয়ালপা স্পেনিশদের হাতে বন্দি হলেন। প্রচুর মুক্তিপণ দিয়েও তিনি রেহাই পেলেন না। তাঁকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝোলানো হল।

১৫৩৩ সালে পিজারো কুজকো অধিকার করেন এবং ইনকাদের মধ্য থেকে মানকো নামক এক যুবককে রাজা নির্বাচিত করেন। মানকো প্রথম প্রথম খুশিই হয়েছিলেন। কিন্তু শিগগিরই তিনি বুঝতে পারেন যে, তাঁকে স্পেনিশদের হাতের পুতুল হয়ে থাকতে হবে। তিনি ছিলেন দেশপ্রেমিক। তাই তিনি নিজের এ অবস্থা মেনে নিতে পারেন নি। ফলে মানকো স্পেনিশদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং নিজের দেশ থেকে তাদের বের করে দেয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু স্পেনিশদের উন্নত অস্ত্রশস্ত্রের সামনে তিনি টিকতে পারেন নি। ফলে মানকো উরুবাম্বা নামক এক দুর্গম উপত্যকায় আশ্রয় নেন। সেখানেও স্পেনিশেরা হানা দেয়। কয়েকটি যুদ্ধের পর তিনি তাঁর শেষ ঘাঁটি ওলানটেটাম্বোতে সরে যান। এখানে তিনি ভিটকোস নামে একটি নতুন শহর গড়ে তোলেন। এই শহর থেকে মানকো স্পেনিশদের ওপর ঘন ঘন আক্রমণ চালান। মানকোর আক্রমণের ফলে পিজারো বড়ই অতিষ্ঠ হয়ে ওঠেন এবং তাঁকে শায়েস্তা করবার জন্য একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। মানকো দীর্ঘ সাত বৎসর স্পেনিশদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি পিজারোর জয়যাত্রা ঠেকাতে পারেন নি। পেরু স্পেনিশদের অধিকারে চলে যায়।

মানকো

হারনান্ডো দ্য লুকু স্পেনিশদের সাফল্য জানার আগেই

facebook/@maktabatuttalamij

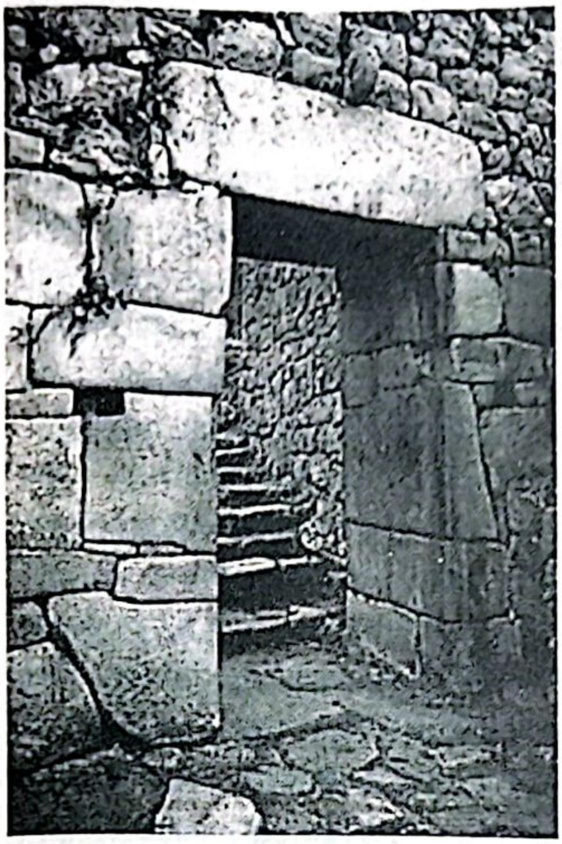

ইনকা দরজা

মারা যান। ফ্রান্সিসকো পিজারো ক্ষমতা লাভের পর তাঁর ভাইয়েরা তাঁর সঙ্গে এসে যোগ দেয় এবং সব সুযোগ-সুবিধা নিজেদের মধ্যে ভাগবণ্টন করে নেয়। পিজারো ও তাঁর ভাইদের কাণ্ড দেখে আলম্যাগ্রো খুশি হতে পারেন নি। বন্ধুত্ব শত্রুতায় পরিণত হল। শেষে তা দু'জনের সমর্থকদের মধ্যে যুদ্ধ পর্যন্ত গড়ায়। আলম্যাগ্রো পরাজিত হন। তাঁর বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আনা হয়। আলম্যাগ্রো দোষী সাব্যস্ত হন। তাঁকে শ্বাসরুদ্ধ করে মারা হয় এবং তাঁর মাথা কেটে ফেলা হয়। ফ্রান্সিসকো পিজারো মারকুইজ খেতাবে ভূষিত হন। তিনি ঘোষণা দেন যে, একমাত্র তিনিই দক্ষিণ আমেরিকা শাসন করার অধিকারী। নিজের ক্ষমতা পোক্ত করার জন্য পিজারো তাঁর ভাই ও অনুসারীদের মধ্যে মুক্ত হাতে পুরস্কার বিতরণ করেন। তিনি যাতে বহাল থাকতে পারেন, সেই তদবিরের জন্য তিনি তাঁর ভাই হারনান্ডো পিজারোকে স্পেনে পাঠান। কিন্তু হারনান্ডোর আগেই আলম্যাগ্রোর এক বন্ধু স্পেনে পৌছান এবং হারনান্ডোকে জেলখানায় কয়েদ করাতে সমর্থ হন। হারনান্ডো দীর্ঘ কুড়ি বৎসর জেলে বন্দি থাকেন এবং ছাড়া পান সহায়-সম্বলহীন এক অসহায় বৃদ্ধ হিসেবে।

ফ্রান্সিসকো পিজারোর দিনও ফুরিয়ে আসে। একদিন তিনি জনকয়েক বন্ধু নিয়ে আহারে বসেন, এমন সময় সেখানে হঠাৎ উপস্থিত হয় আলম্যাগ্রোর অনুগত লোকজন। হাতাহাতির এক পর্যায়ে তারা পিজারোর বুকে ছুরি বসিয়ে দেয়। পিজারো নিহত হন। যে লোকটির দৃঢ়তার কারণে শক্তিশালী ইনকাসাম্রাজ্য স্পেনের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং দক্ষিণ আমেরিকায় স্পেনের প্রভুত্ব স্থাপিত হয়, সেই লোকটির জীবন প্রদীপ এমনি করুণভাবে নিভে যায়।

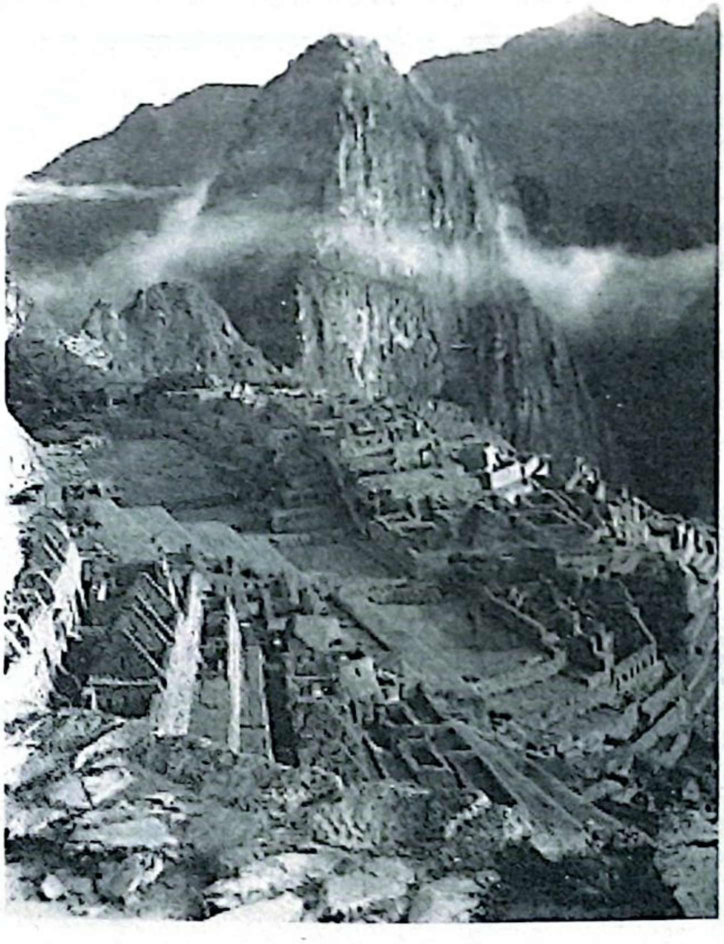

দুর্গম উরুবাম্বা উপত্যাকা

facebook/@maktabatuttalamij

কুয়ার ভেতর ইতিহাস

দিনটি ছিল ভারি সুন্দর ঝলমলে। এমনি দিনে মায়া জাতির লোকজন তাদের দীর্ঘদিনের শ্রমে গড়া শহরগুলো ছেড়ে চলে গেল। চলে গেল তাদের সাধের মাতৃভূমি থেকে। মধ্য আমেরিকার মেক্সিকো নামে একটি দেশ আছে। তার একেবারে উত্তর ঘেঁষে নিজেদের জন্য আবার গড়ে তুলল একটি নতুন রাজ্য। নাম দিল ইউকাতান। আবার সেখানে তৈরি করল তাদের নতুন শহর। ভরিয়ে তুলল সব জাঁকালো দালান-কোঠা দিয়ে, সাজিয়ে তুলল মন্দির, নাটঘর ইত্যাদি দিয়ে। পুরনো জায়গা ছেড়ে দিয়ে নতুন একেবারে অজানা-অচেনা জায়গায় কেন তারা দলে দলে চলে গেল, তা কিন্তু আজো কেউ জানে না।

চিচেন-ইটজা নামের একটি জায়গা হল তাদের দেশের নতুন রাজধানী। এখানে আবার তৈরি হল অদ্ভুত অদ্ভুত সব মন্দির, সিঁড়িঅলা পিরামিড, মানমন্দির, বিশাল বিশাল সব নাচঘর ও রাজপুরী। লাইব্রেরি-পাগল এক লোক। পুরনো তথ্য সংগ্রহের কাজে তিনি ছিলেন এক দারুণ নিবেদিত কর্মী। স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদের লাইব্রেরিগুলো তিনি তন্ন তন্ন করে খুঁজে বেড়াচ্ছেন। কী খুঁজছেন তিনি সেখানে? তাঁর জন্মের অনেক অনেক দিন আগে– সেই ষোড়শ শতাব্দীতে এক পাদ্রি লিখে গিয়েছেন ঐ চিচেন-ইটজার বিবরণ। সেই বিবরণই তিনি খুঁজছেন। খুঁজতে খুঁজতে খুঁজতে– রীতিমতো অবাক করা কাণ্ড– এক সময় পেয়েও গেলেন সেই বিবরণ। আনন্দে তাঁর বুক নেচে উঠল। লাইব্রেরি পাগল লোকটির নাম ছিল ব্রাসিউর। বিবরণীটি তিনি বই আকারে প্রকাশ করেন ১৮৬৪ সালে। সঙ্গে সঙ্গে যেন ঝড় বয়ে গেল। অনেকেই বিশ্বাস করতে চাইলেন না ঐ ধর্মযাজকের কথা। তাঁরা তাঁকে মনে করতে লাগলেন গল্পবাজ হিসেবে। ঐ পাদ্রির নাম ছিল দিয়েগো

চিচেন-ইটজা

facebook/@maktabatuttalamij

দ্য লান্ডা। তিনি জন্মেছিলেন ১৫২৪ খ্রিস্টাব্দে এবং মারা যান ১৫৭৯ খ্রিস্টাব্দে। নিজের ধর্ম ছাড়া অন্য ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর ধারণা মোটেও ভালো ছিল না। তাই তিনি মনে করলেন, ঐ সব ধর্মের বই-পুস্তক থাকার কোনো দরকার নেই। যেমন ভাবা তেমন কাজ। অন্য ধর্মের বই-পত্তর তিনি পুড়িয়ে ফেলতে লাগলেন। এ কাজের পুরস্কার পেতেও তাঁর দেরি হয় নি। তাঁকে দেয়া হল ইউকাতানের রাজধানী মেরিদার বিশপের লোভনীয় পদটি। কিন্তু হঠাৎ-ই দিয়েগো দ্য লান্ডার মতের পরিবর্তন ঘটে। তিনি ইন্ডিয়ান দলিল-দস্তাবেজ সংরক্ষণের কাজে মনোযোগী হয়ে ওঠেন এবং মায়া জাতির সামাজিক রীতি-নীতি ও আচার-আচরণ জানার বিষয়ে খুবই উৎসাহ বোধ করেন। তাঁর মনের হঠাৎ এই পরিবর্তন সম্বন্ধে অবশ্যি কিছুই জানা যায় না। মায়া জাতির ইতিহাসের প্রতি তাঁর নজর কেন ও কেমন করে পড়ল, তাও জানার উপায় নেই।

মায়া সভ্যতার নিদর্শন

দিয়েগো দ্য লান্ডা তারপর তাঁর সংগৃহীত তথ্য দিয়ে ইউকাতান সম্পর্কে একখানি বই রচনা করেন। ব্রাসিউরের কাছে বইখানি খুব মূল্যবান বলে মনে হয়েছিল এবং তিনি সেটি সম্পাদনা করে প্রকাশ করে ফেলেন। কিন্তু দ্য লান্ডাকে গল্পবাজ মনে করে লোকেরা তাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন নি। কিন্তু এঁদের মধ্যে এমন একজন ছিলেন, যিনি পাদ্রির লেখা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীটি বিশ্বাস করে ফেলেন। হেনরিক শ্লিমান যেমন বিশ্বাস করেছিলেন হোমারের ইলিয়াডের গল্প, তেমনি তিনিও বিশ্বাস করেছিলেন দিয়েগো দ্য লান্ডার কাহিনী। আর হেনরিক শ্লিমানের মতো তাঁর বিশ্বাসও সঠিক বলে প্রমাণিত হয়েছিল। যে লোকটি দ্য লন্ডার কথা বিশ্বাস করেছিলেন, তাঁকে হয়তো তোমাদের জানার কথা নয়। তবে আমরা জানি, তিনি ছিলেন একজন মার্কিন আবিষ্কারক। আর তাঁর নাম ছিল এডওয়ার্ড হার্বার্ট টমসন। তিনি দিয়েগো দ্য লান্ডার কথামতো চিচেন-ইটজার একটি কুয়ার একেবারে তলা থেকে বের করে এনেছিলেন অমূল্য সব প্রত্নতাত্ত্বিক ধনসম্পদ। বলা যায়, এডওয়ার্ড হার্বার্ট টমসন কুয়ার নিচের কাদামাটি থেকে উদ্ধার করেছিলেন মায়া জাতিরই হারিয়ে যাওয়া ইতিহাস।

দিয়েগো দ্য লান্ডা

বিশপ দিয়েগো দ্য লান্ডা বলেছিলেন, চিচেন-ইটজায় একটা বেশ বড় কুয়া ছিল। আর ঐ কুয়া ছিল মানুষ বলি দেয়ার জায়গা। প্রতি বৎসর শুকনো মওসুমে সেখানে অল্প বয়সের

facebook/@maktabatuttalamij

মায়া বর্ষপঞ্জি

মেয়ে-যুদ্ধবন্দিদের বলি দেয়া হত এবং প্রচুর মণিমুক্তা ফেলা হত বৃষ্টির দেবতাকে খুশি করার জন্য। টমসন ডুবুরির ট্রেনিং নিলেন এবং দীর্ঘ দিনের পচা নোংরা কালো পানির মধ্যে নেমে পড়লেন। ঐ কুয়াটি ছিল একটা বিশাল পুকুরবিশেষ। দেখতে অনেকটা গোলাকার। বেশ গভীর। কিন্তু কত গভীর, তার সঠিক হিসেব নেয়া হয় নি। কুয়াটা এপাশ থেকে ওপাশে চওড়া ছিল ১৮৭ ফুট। চুনা পাথরের পাড় ছিল খাড়া। উঁচু প্রায় ৫০ ফুট। টমসন কুয়া ছাঁকতে শুরু করলেন। একদিন দু'দিন তিনদিন– কিন্তু না, কিছুই পাওয়া গেল না। তিনি অনেকটা হতাশই হলেন। তাঁকে দিয়ে বুঝি এ কাজ হবে না। তবু তিনি হাল ছাড়লেন না। পাশেই বাহামা দ্বীপ। সেখান থেকে ভাড়া করে আনলেন ঝানু ডুবুরি। তিনি নিজেও পরে নিলেন ডুবুরির পোশাক। নেমে গেলেন একেবারে কুয়ার নিচে। যেসব জিনিস তিনি কুয়ার নিচ থেকে ওপরে তুললেন, তা থেকে পাওয়া গেল বিশপের ভয়ঙ্কর সব প্রতিশোধের আলামত। সেগুলোর মধ্যে ছিল মানুষের ভাঙাচোরা কঙ্কাল, সোনার ওপর কারুকাজ করা চমৎকার সব অলঙ্কার এবং আরো কত জিনিসপত্তর। মনে হয়, ঐ সব জিনিস দান করা হয়েছিল বৃষ্টির দেবতাকে খুশি করার জন্য। দিয়েগো দ্য লান্ডা তাঁর বর্ণনায় যা যা বলেছিলেন, টমসন কুয়ার তলা থেকে তুলে আনলেন তার প্রায় সব কিছু।

কুয়া থেকে টমসন যেসব সোনার অলঙ্কার উদ্ধার করেছিলেন, সেগুলো যেমন ছিল বিরল, তেমনি যে ধাতু দিয়ে সেগুলো তৈরি ছিল, তাও ছিল দুর্লভ। সোনা-রূপার লোভে স্পেনিশ লুটেরারা সে দেশে গিয়েছিল; সোনা-রূপার লোভে তারা সে দেশ জয় করেছিল। মেক্সিকো দেশ তারা লুট করেছিল, মেক্সিকোবাসীর ওপর অত্যাচার চালিয়েছিল এবং নিষ্ঠুরভাবে তাদের হত্যা করেছিল। স্পেনিশেরা ধাতুর মূল্য বুঝত। তবে আস্ত ঐ সব সোনার গয়নাগাঁটি জাহাজযোগে দেশে পাঠানো সহজ ছিল না। তাই তারা সেগুলো গালিয়েছিলেন, সুন্দর সুন্দর সোনার থালা-বাসন, ঘটি-বাটি, চমৎকার সব সোনার জিনিসপত্তর সোনার পাতে পরিবর্তন করেছিল।

মায়া সভ্যতার পাথরে তৈরি মূর্তি

facebook/@maktabatuttalamij

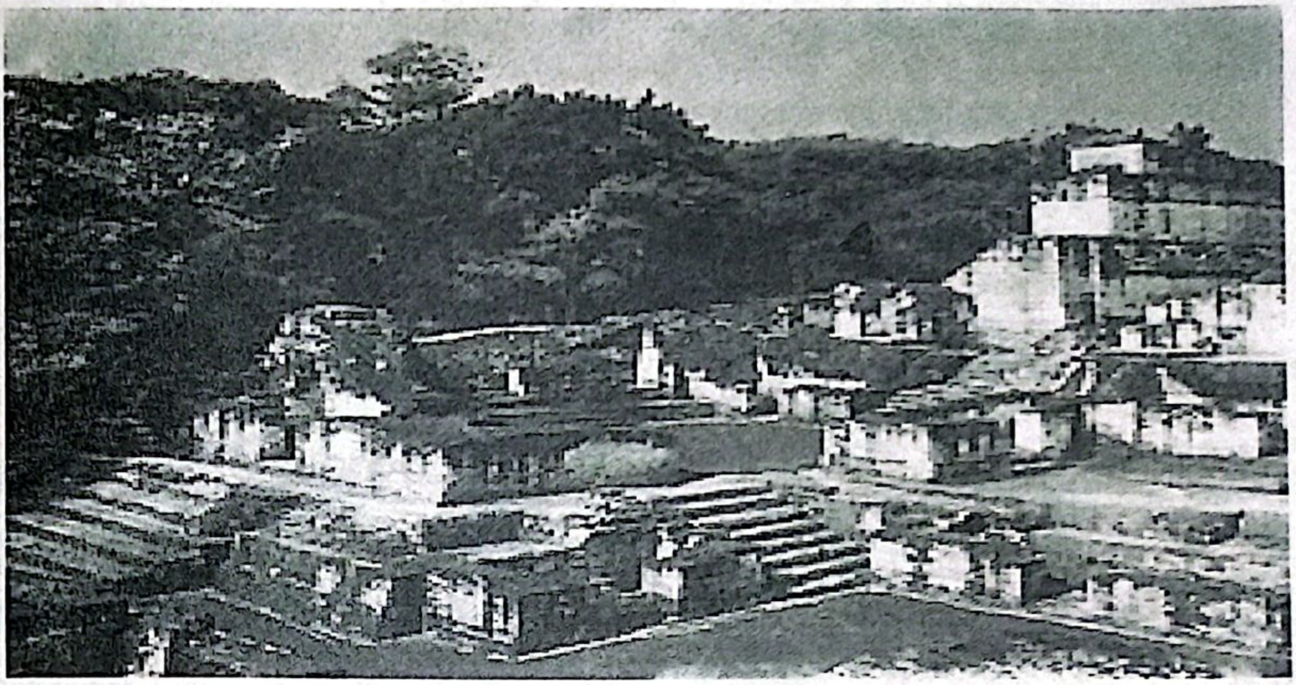

ইউকাতান নগরী

গলানো জিনিসগুলো দেশে পাঠাতে আর কোনো অসুবিধ হয় নি।

কিন্তু কুয়ার ভেতর যে সব জিনিস নিক্ষেপ করা হয়েছিল, সেগুলো লোকের জানার বাইরেই রয়ে গিয়েছিল। টমসন যখন কুয়ার প্রায় আশি ফুট নিচে নামলেন এবং সেগুলোর খোঁজ-খবর নিলেন, তখন তিনি নিজেই অবাক হয়ে দেখলেন যে, কুয়ার ভেতরে জিনিসগুলো যে অবস্থায় ফেলা হয়েছিল, ঠিক তেমনটিই রয়েছে, তাদের কোনো ক্ষয়-ক্ষতিই হয় নি। ফলে টমসনের যেমন আনন্দের সীমা রইল না, তেমনি তাঁর দুঃসাহসী কাজের জন্য ওগুলো মায়া সভ্যতার অপূর্ব নিদর্শনরূপে পাওয়া সম্ভব হয়েছে এবং মায়াজাতির ইতিহাস রচনায় যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

কিন্তু পানির মধ্যে ডুবে ডুবে টমসনের স্বাস্থ্য ভেঙে গিয়েছিল। কিছুটা বধিরও হয়ে গিয়েছিলেন তিনি। বেশি পরিশ্রমের ফলে পরে তিনি খোঁড়াও হয়েছিলেন। তাঁর এই শারীরিক ত্রুটি তাঁর কাজের ওপরও প্রভাব বিস্তার করেছিল। তিনি একমনে কাজ করতে পারেন নি। ফলে তিনি তাঁর কাজের যেসব রিপোর্ট প্রকাশ করেছিলেন, সেগুলো

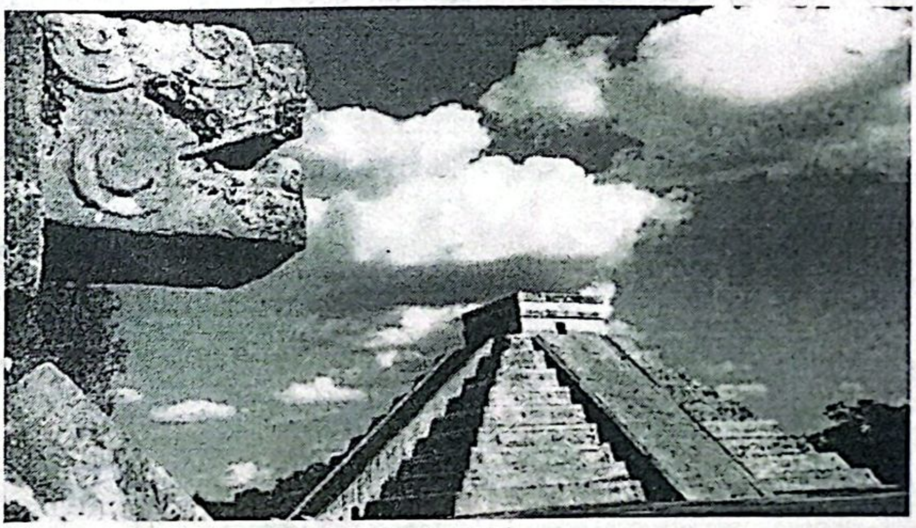

মায়া সভ্যতা

facebook/@maktabatuttalamij

নির্ভুল ও পরিচ্ছন্ন হতে পারে নি। তবে তাঁর কাজে আন্তরিকতার অভাব ছিল না।

টমসন গভীর উৎসাহ নিয়ে তাঁর গবেষণার কাজ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু হঠাৎ-ই তাঁর কাজে বাধা পড়ে। মেক্সিকো সরকার তাঁকে জাতীয় সম্পদ চুরির দায়ে অভিযুক্ত করে। অভিযোগের খেসারত হিসেবে তাঁকে বিপুল পরিমাণ অর্থ জরিমানা করা হয় এবং ইউকাতানে তিনি যে সম্পত্তি কিনেছিলেন, তা বাজেয়াপ্ত করা হয়। তিনি ভয় পেয়ে যান এবং দিশেহারা হয়ে পড়েন। তিনি ভাবলেন, অশুভ শক্তি চারদিক তাঁকে ঘিরে ফেলেছে। দারুণ বিপদের মধ্যে তিনি পড়েছেন বলে তাঁর মনে হল। কী করা যায়! কিছু ভেবে পেলেন না। কিন্তু উপায়ও নেই। তড়িঘড়ি করে স্থির করলেন– আর মেক্সিকো নয়। যেমন করে হোক, এখান থেকে তাঁকে পালাতে হবে। ধরা ছোঁয়ার বাইরে যেতে হবে মেক্সিকো সরকারের।

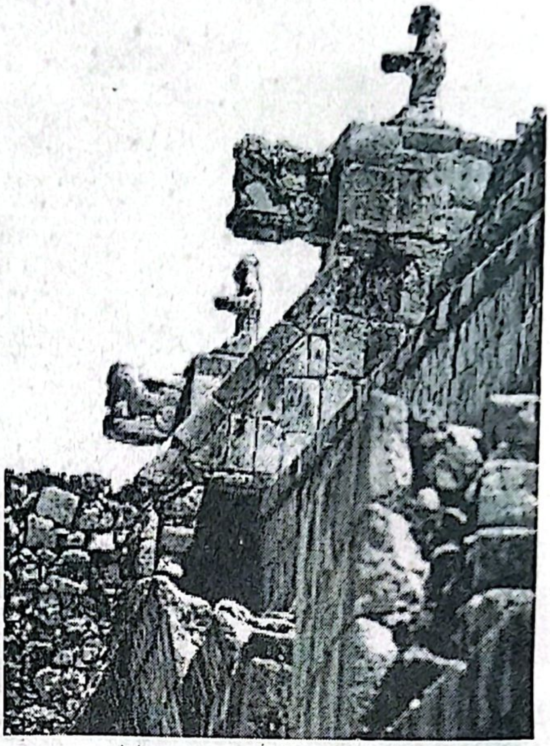

ইউকাতান নগরীর ধ্বংসাবশেষ

তিনি একখানা জাহাজ ভাড়া করলেন। কিন্তু তাড়াহুড়োর মধ্যে তিনি এমন একখানি জাহাজ ভাড়া করলেন, যা তখনো পুরোপুরি তৈরিই হয় নি। তার ওপর তাঁর দলেও ছিল বেশকিছু লোক। সংখ্যায় তাঁরা ছিলেন ছাব্বিশ জনের মতো। এতগুলো লোকের জন্য জাহাজে কিন্তু খাদ্য ছিল মাত্র এগারো দিনের। আর জাহাজটা ছিল এমন যাতে ছিল না দিগদর্শন যন্ত্র। তাই সময় লাগল এগারো দিনের জায়গায় তেরো দিন। সে এক নিদারুণ অভিজ্ঞতা। খেয়ে না খেয়ে ভয়াবহ পরিস্থিতি সামাল দিয়ে টমসন শেষে কোনোমতে পৌঁছালেন গিয়ে কিউবায়। এই যাত্রাই তাঁর শেষ যাত্রা। সাধের মেক্সিকোতে তাঁর আর কোনোদিন ফিরে যাওয়া হয় নি।

আজটেক ইমারত

facebook/@maktabatuttalamij

প্রত্নতত্ত্ব নামের বিজ্ঞান

শামসুল হক

বাশিশুএ ৬২৭

প্রকাশক : শাওলী সুমন, পরিচালক, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী, পুরনো হাইকোর্ট এলাকা, ঢাকা-১০০০। মুদ্রণে : ক্রিডেন্স প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজিং লিমিটেড, ১৭ বিজয় নগর, ঢাকা-১০০০। প্রকাশকাল : জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫, জুন ২০০৮। প্রচ্ছদ ও বইনকশা : মামুন হোসাইন। মূল্য : ৩৩.০০

PROTNATATTA NAMER BIJNAN (A Book on Archaeology for Children) By SHAMSUL HUQ. Publisher : Shaoli Sumon, Director, Bangladesh Shishu Academy, Old High Court Compound, Dhaka-1000, Bangladesh. Date of Publication : June 2008. Cover & Book-design : Mamun Hossain.

Price : Tk. 33.00
US $ 2.00

ISBN : 984-70076-0627-6

facebook/@maktabatuttalamij